পীযূষ রাউত

নির্বাচিত কবিতা

নির্বাচিত কবিতা

পীযূষ রাউত

স্রোত

স্রোত প্রকাশনা

উদ্দীপ্ত সংগ্রহশালা ঃ হালাইমুড়া ঃ কুমারঘাট-৭৯৯২৬৪ ঃ উত্তর ত্রিপুরা

nirbachito kabita : pijush rauth

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি -২০১০
প্রচ্ছদ ঃ কৃষ্ণধন আচার্য
বর্ণসংস্থাপন/গ্রাফিকস্ ঃ নির্মল দত্ত
কৃতজ্ঞতা ঃ মিলনকান্তি দত্ত
পরিবেশক ঃ অসিত দাস, প্রযত্নে 'উবুদশ', ২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২
ফোন ঃ ০৯৪৩৩৮১৯১০৩
মুদ্রণ ঃ গ্রাফিপ্রিন্ট, হালাইমুড়া, কুমারঘাট, উত্তর ত্রিপুরা
চলমান ঃ ৯৪৩৬১৬৭২৩১
প্রকাশক ঃ পদ্মশ্রী মজুমদার
ISBN-978-81--906958-9-3
মূল্য ঃ ২০০ টাকা

অর্পণ—

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাভাজনেষু—

রচনাকাল □ ১৯৬৫-২০০৯



বিষণ্ণ উদ্যানে বৈশাখ

পিলাক ঃ আগবতলা

প্রকাশকাল · ফাল্গুন ১৩৯৬

রমণীমোহনকে

আমি ঈশান,অগ্নি, নৈঋত ইত্যাদি কৌণিক দিকগুলি খুঁজে খুঁজে
আমার আবাল্য বন্ধু রমণীমোহন, ঠিকানা পেলুম না তোর।
বৈশাখের ঝড়ে আক্রান্ত নাবিক, মরুঝড়ে বোবা বেদুইন, আমি তোর
ঠিকানা পেলুম না রমণীমোহন।

তোর চরিত্র নিয়ে গল্প লিখে একদা বিখ্যাত হয়েছিলুম।
রমণীমোহন, তোর নিরুদ্দেশ যাত্রার পর আমার আর গল্প লেখা হলনা।
অনেকটা দূর অতীতে, প্রথম যৌবনে, খুদে কাগজে ছাপার অক্ষরে
নিজের নাম দেখে বুড়ো হালদারবাবু যেমন অবাক ও পুলকবোধ করেন,
অধুনা নির্জনে আমিও তেমনি অপাংক্তেয় হয়ে রমণীমোহন,
তোকে খুঁজছি ঈশান, অগ্নি ও নৈঋত কোণে একবার নয়, বারংবার।

পরিদর্শকের ভূমিকায়

কিছু লিখতে গেলেই
        আমার অতিপ্রিয় ভাঙা চায়ের পেয়ালার কথা
        আমার চুরি যাওয়া হংকং মেড টর্চের কথা
        কৈশোরে পঠিত ঠাকুরমা'র ঝুলি, গোপালভাঁড়
        কিংবা আরব্য উপন্যাসের কথা হৈ-হৈ করে
                                        ভিড় করে আসে।

কিছু ভাবতে গেলেই
        কল্পনার বেআব্রু চোখে এসে ভিড় করে
        দুঃস্বপ্নের শিংওয়ালা দৈত্য, গভীর কূপ,
        সহস্র শ্বাপদ জন্তু, দুরারোগ্য অসুখের স্মৃতি।

কিছু দেখতে গেলেই
        চোখের উপর অন্ধ-কালা-বোবাদের অতিদীর্ঘ [illegible]।

কিছু শুনতে গেলেই

এখানে, এই মহকুমা শহরে
        যখন নিঃসঙ্গ শুয়ে আছি পা-ভাঙা তক্তপোষে, চেতনার
        অন্তর্দেশে অনুভূত হয় বৃশ্চিক দংশন। ধীরে ধীরে
        মাতৃজঠরের গভীর অন্ধকার নিদ্রাচ্ছন্ন করে আমি
        ঘুমিয়ে পড়ি।

বিষণ্ণ উদ্যানে বৈশাখ

সত্য, তোমাকে আমি কী দিতে পারতাম?
বৈশাখ?
হ্যাঁ, বৈশাখ দিতে পারতাম। নিছক বৈশাখ।
বিষণ্ণ উদ্যানে বৈশাখ। অথচ
এই বৈশাখেই আমার ঘব ভাঙল ঝড়ে
বৈশাখেই প্রথমবার আমার নৌকাডুবি হল
বালাগঞ্জের হাওরে।

মধ্যহাওরে
বিস্তর ঢেউয়ের মধ্যে আমার অবসন্ন হাত
উঠছে
পড়ছে
উঠছে
পড়ছে ...
সত্য, এই ভাবে তোমার উঠোনে কায়ক্লেশে
পৌঁছে গিয়ে দেখি
মান্দার গাছ থেকে একটি করে প্রত্যেকটি পাতা
খসে পড়ছে
খসে পড়ছে।
সত্য, তোমাকে আমি কী দিতে পারতাম?
বৈশাখ?
হ্যাঁ, বৈশাখ দিতে পারতাম, রাগী বৈশাখ।

মধ্যরাত্রির ব্যাণ্ডবাদক

ঘাসফড়িঙের আন্দোলিত ডানা
ভেঙে যায়
ভেঙে যাচ্ছে
ভেঙে যাবে বলে
এ
ক
দি
ন
মধ্যরাত্রে শাসন করব
শহরের তামাম বড় বড় সড়ক।
যেহেতু উভয় পার্শ্বের
ঘুমন্ত বাড়িগুলির
ঘুমন্ত মানুষদের
ঘুমন্ত ইচ্ছের মত বিষাক্ত নই বলে
এ
ক
দি
ন
ততটা নিষ্ঠুর ও কুড়ের বাদশা নই বলে
মধ্যরাত্রে
ব্যাণ্ড বাজিয়ে
শহরের তামাম বড় বড় সড়ক
শাসন করতে করতে
গান করব ক্রোধের ও ধ্বংসের।

একটি কবিতার জন্ম

স্বপ্নে এক কঠিন পাথুরে পাহাড়।
স্বপ্নে এক ঝর্ণাগতি নদী।
স্বপ্নে এক নিষ্ঠুর পাথুরে হৃদয়।
এইসময়
তীব্র ভূ-কম্পনে
পৃথিবী কেঁপে উঠলে
শক্ত পাথরগুলো
ডিমের খোলের মত
গড়িয়ে পড়ে
পাহাড় থেকে পাহাড়ে
পাহাড় থেকে নদীতে ...

এবং এইভাবে শক্ত পাথরগুলো
এক স্বচ্ছন্দগতি নদীর মধ্যে হারিয়ে গেলে
একটি কবিতা ধ্বনিত হয়ে ওঠে ঃ
পাথর পাথর বুকের ঘৃণা
দীর্ঘ সময় বন্ধ ছিল ঘরে।
পাথর পাথর বুকের দুঃখ
দীর্ঘ সময় বন্ধ ছিল ঘরে।

আমার প্রেম

আমার প্রেম
তোমার ভ্রমণ ছন্দের মত
'ঝর্ণা ঝর্ণা সুন্দরী ঝর্ণা'
আহা, নদী যেন দূরান্তিক ব্রহ্মদেশ—ইরাবতী নদী।

আমার প্রেম
শব্দভাণ্ডার শব্দের মত
গড়িয়ে পড়ছে   কোলিয়ারি গহ্বরে;
ছড়িয়ে পড়ছে শক্তমাটি, কয়লা।
শাবলের শব্দের মত দীপ্ত
                                        কঠিন আমার প্রেম।

আমার প্রেম
শব্দহীনতার মৃত উপত্যকায় হারিয়ে যাচ্ছে
ডুবিয়ে দিচ্ছে
শূন্য আলোক সমুদ্র বন্দর
                                        আমার প্রেম।

আমার প্রেম
ডায়নোসরের নির্জন ভয়ংকর পৃথিবীতে
নির্ভয়ে ঘুরছে ফিরছে
সাইক্লোনিক হাওয়ার মত
শব্দ তুলছে শব্দ ভাঙছে
তারপর
শব্দহীনতায় ডুবে গিয়ে প্রবল অন্ধকার রাতে
ঘুম নেই
ভাবনা নেই
ভয় নেই কিছু নেই
আমার প্রেম।

আমার প্রেম
দাবানলের মত পুড়িয়ে দিচ্ছে জ্বালিয়ে দিচ্ছে
কঠিন বৃক্ষমূল।   তোলপাড় কাণ্ড হয়ে
ভেঙে পড়ছে পাহাড় পর্বত।
আমার প্রেম
অশ্রুত দূর্বার অবোধ্য শব্দের মত
গড়িয়ে পড়ছে
পাহাড় ভাঙছে নদী।
ভগীরথ, এইবার যথার্থ সময়,
তুমি শঙ্খ হাতে নাও।

স্বাধীনতার গান

একদিন সকাল ন'টায় জনৈক ভিখিরি
পুরোনো কাপড় চাইলে ভারী নীল পর্দা খুলে দিই—এই নাও এটা তোমারই।
সেইদিন তারপর, ইনডাস্ট্রিতে সাইরেন বাজলে সন্নিহিত নদীজলে স্নান, ডালভাত
অতঃপর স্কুলবাড়িতে অভ্যস্ত সময়। বিকেলে বাড়ি ফিরে উষ্ণ চা-কাপে
অবসন্ন বিকেল তাজা হয়ে ওঠে বাচ্চাদের কোলাহলে সহাস্য উঠোন এবং
অদূরবর্তী বঙ্কিম পথ।

অনুরূপ গৃহস্থ সন্ধ্যায় মহাপুরুষের উক্তির মত
মনে মনে বাক্যমালা তৈরী হয় : আমরা ভিন্নতর জন্ম চাই ভিন্নতব আলোক-শতক।
গ্রহপুঞ্জ যেন জ্বলে উঠে নিমেষে একহাজার অশ্বের চেয়ে তেজি হাজার উল্কা
ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাগল আকাশ ঢেকে যায়। বাইরে রক্তিম অন্ধকারে
স্বচ্ছ জ্যোৎস্নায় অলৌকিক রাত।
যেন একলক্ষ নবজন্মের শঙ্খশব্দ বিশ্বকে ভুবন করে তোলে। এইসময় এইখানে
কৈলাসহরে বলরাম ঢুলির কণ্ঠে ধ্বনিত হয় স্বাধীনতার গান—'উঠ গো
ভারত লক্ষ্মী ...।' এবং
আমাদের কল্লোলিত যুবক রক্তে গান হয়ে বেজে ওঠে জীবনের অন্য কোনো মানে।
এইসময়, অদূরে ঘরের দেয়ালে বাতাস-আন্দোলিত ক্যালেণ্ডারে ছুটে যাচ্ছে
সাদা লাল রাজ্যপরিবহনের বাস। ঝুলন্ত মানুষ নেই। থির নির্জন সৌখিন
নাগরিক। যেন বাড়িতে প্রশস্ত উঠোনে দক্ষিণের উদার বাতাস—
লাল সূর্য ঝলসে ওঠে পশ্চিমের দিকে।

সোনালি মাছের গল্প

আমাকে তুমি সোনালি মাছের গল্প বলনা।   সোনালি মাছ
সেই ক্রোধী শিকারীরা কবে খুন করেছে।
এখন শূন্য জলের মধ্যে নিষ্ঠুর তিমি এবং হাঙরের
বিশাল চোয়াল!

এই জলে বর্ণ নেই। গন্ধ নেই। স্বপ্ন নেই।
হিমেল ঘুমের শয্যায় অদৃশ্য ঘাতকেরা স্মৃতির শরীর থেকে
মাংস খাবলে নেয়।

নদী বালুচরে পথভ্রান্ত হলে এখানে নৌকো নেই। জল নেই।
আমাকে তুমি সোনালি মাছের গল্প বল না।   সোনালি মাছ
সেই কবে স্মৃতি হয়ে গেছে।

আমরা কয়েকজন কয়েকজনের জন্য

আমরা কয়েকজন কয়েকজনেব জন্য
চিরকাল বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকব।   যেমন দেশের বাড়িতে
নৌকোব জন্য প্রতীক্ষমান মা ও আমি, আমি ও ছোট ভাই
নদীতীরে

উদ্দাম হাওয়ার মধ্যে
আমরা কয়েকজন কয়েকজনের জন্য
চিরকাল ঘনিষ্ঠ প্রেমের জন্য উন্মুখ ইচ্ছাগুলি
মিছিলের দাবিব মত সোচ্চার।   এগুলো সমুদ্রে বিক্ষিপ্ত
ভ্রমণ নয়; মাঠে নেমে
বল না ছুঁয়ে পূর্ণাঙ্গ খেলা।   কারণ সবল বাহুদ্বয় উঠে পড়ে
আন্দামান দূরে নয়, গোলবার অনতিদূরে। বহুদূরে
শ্রেণীবদ্ধ মেঘ যদি গলে গলে
পাগল বৃষ্টির স্রোতে গর্জন করে জাটিঙ্গার মত
কোমল নদী;
আমি ও সান্ত্বনা, সান্ত্বনা ও সৈকত আমরা কয়েকজন
কয়েকজনের জন্য চিরকাল,
চিরকাল প্রতীক্ষার পথ।

আমি কোথায়

আমি কোথায়?
কোথায় আমি? আমার প্রশ্ন উদাসীন পর্বতমালায় প্রতিধ্বনি তুলল—
আমি কোথায়?
কোথায় আমি?

আমার পায়ের নীচে এক বিষাক্ত কেঁচো। আমি চমকে উঠে বিষমভয়ে
লাফ দিয়েছি। এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসভর্তি বেলুনের মত শূন্যে উঠতে উঠতে
আমি একসময় সশব্দে ফেটে গেলে
আমার দেহ
বহু নীচে পড়ছে তো পড়ছেই
পড়ছে তো পড়ছেই

আমি কোথায়?
কোথায় আমি? আমার প্রশ্ন উদাসীন পর্বতমালায় প্রতিধ্বনি তুলল—
আমি কোথায়?
কোথায় আমি?

একদিন সর্বজ্ঞ পণ্ডিত, দশহাজার শ্রোতৃমণ্ডলী পরিবৃত মঞ্চে আমি
উপস্থিত হলুম। এবং আমার ভ্রাতা ও ভগিনীগণ ... বলার সঙ্গে সঙ্গেই
আমার গলার উপর রুলার চেপে বসল। কোন দুর্মুখ শ্রোতা
আমার মুখের উপর পচা ডিম ছুঁড়ে মারল। পরমুহূর্তে আমি তিন লাফে
মঞ্চ ও হলঘর পেরিয়ে পথে নেমে যেই না স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছি,
অমনি কে যেন আমার শরীরের মধ্যে ব্রেকহীন মোটরের ইঞ্জিন লাগিয়ে
দিল। ভীষণ জোরে আমি দৌড়ুচ্ছি। মাত্র কুড়ি হাত দূরে মহানগরের
খুনে রাজপথ। সবুজবাতি জ্বলে উঠল পলকেই। থামা হলনা।
আমি দৌড়ুচ্ছি তো দৌড়ুচ্ছিই ... ...
দৌড়ুচ্ছি তো দৌড়ুচ্ছিই ... ...।

আমি কোথায়?
কোথায় আমি? আমার প্রশ্ন উদাসীন পর্বতমালায় প্রতিধ্বনি তুলল ...
আমি কোথায়?
কোথায় আমি?

সৈকতের শরীর

সৈকতের শিশু শরীরে হাত দিলেই
রক্তের মধ্যে শিহরণ অনুভূত হয়।

কল্যাণপুর হাসপাতাল চত্বরে ট্রেঞ্চ খুঁড়ছে
রামচন্দ্র নামে জনৈক দিনমজুর।
যুদ্ধ লাগতে পারে, যুদ্ধ লাগবে, এইরকম
একটা উন্মাদ বাতাস ফিসফিস করছে
দীর্ঘ কয়েকমাস।

যদি সত্যি হয়? যদি সত্যি হয়?
সৈকতের শিশু শরীরে হাত দিলেই
রক্তের মধ্যে শিহরণ অনুভূত হয়।
সৈকত, শোন্ বাবা, আমরা বাঁচব তো?

আমার কবিতার ডায়েরির আশেপাশে
কয়েকটা ইঁদুরছানা ছুটোছুটি করে সারারাত।
টর্চ জ্বালতেই আলোয় আলো, কোথাও
কিছু নেই। কোন শব্দও নেই।

সৈকত ও কবিতার ডায়েরি
আমার মনের মধ্যে শরীরের অলিতে গলিতে
এক অন্ধ ভালবাসার স্রোত
নদী হয়ে ছুটে।

গোপন দুঃখে, অজানিত আশঙ্কায়
কেঁপে ওঠে একত্রিশের দেহ। জোরে
হাঁক দিই—কই হে কৃষ্ণ
ছিলে কোথায় এতক্ষণ?

তাঁর সম্পর্কে

হাসিমুখে সমস্ত গ্রীষ্ম তিনি দাঁড়িয়েছিলেন
তাঁব নীল পোযাক। তাঁব বিশাল দুই হাতে
আমাদেব সকলের জন্য ভালবাসা।
তাঁকে বলা হত—এক সমুদ্রগামী জাহাজ আপনাকে বিদেশ
নিয়ে যাবে। আপনি যাবেন?
তিনি কোনো উত্তব দিতেন না। শুধু হাসতেন।
এখন গ্রীষ্ম নেই। চতুর্দিকে কুযাশা থেকে প্রচণ্ড বারিপাত,
চেতনায় হিমবাহ থেকে অপঘাত মৃত্যু, আমাদের
কৃশ ও কর্কশ দেহে বিষময় স্ফোটক। তখন
বহুদূর থেকে তিনি ঘোষণা করলেন—
আমাকে স্মবণ কর।
তাঁর নীল পোষাক আগুনে ঝলসে উঠত। পুড়ত না।
তাঁর বিশাল দুই হাতে আমাদের সকলের জন্য ভালবাসা।
তাঁকে বলা হত—বিদেশগামী জাহাজ আপনাকে নিয়ে যাবে;
আপনি যাবেন?
তিনি কোনো উত্তর দিতেন না। শুধু হাসতেন।

ভুল—এক ক্ষুধার্ত জোঁক

এই রকম একটা অদ্ভুত ধারণা আমার—ভুলেব নাম মৃত্যু, মৃত্যুব নাম ভুল। কাবণ
ভুলক্রমেই আমার জন্ম। ভুলক্রমেই যৌবন ও বার্ধক্য। অবশেষে মৃত্যু।
এই দ্বিতীয় মৃত্যু আসলে দেহগত। অর্থাৎ নিতান্তই সাদামাটা।

আমি তিনতলা বাড়ির ব্যালকনিতে ঝুঁকে পড়ে মানুষ দেখি। গাড়ি। গাড়ির ভিতরে
মানুষ। মানুষের ভিতরে একটা দুর্দান্ত পশু দেখলে পশুর ভিতরে মানুষ।
এই দ্বিতীয় মানুষ একটা প্রাচীন মুদ্রার মত যা নিতান্তই ইতিহাস।

ভুলক্রমেই এইসব চিন্তাধারা। এবং এইহেতু ভুলক্রমেই একদিন পৌঁছে যাব ভুল ঠিকানায়।
জনপদের বদলে মরুভূমিতে।
এই রকম একটা অদ্ভুত ধারণা আমার—ভুলের নাম মৃত্যু, মৃত্যুর নাম ভুল। কারণ
এক অতি নিষ্ঠুর ক্ষুধার্ত জোঁকের মত আমার বুকের সঙ্গে এঁটে আছে ভুল।
কোনোমতেই তাকে আমি ছিন্ন করতে পারি না। কোনোমতেই না।
এইরকম একটা ধারণা আমার—ভুলের নাম মৃত্যু, মৃত্যুর নাম ভুল।

বহু যোজন দূর

সাধের কথা
আহ্লাদের কথা বহু যোজন দূর।
কার্পাস তুলো কোথায় জন্মে, বিস্তর জন্মে,
ক্লাস নাইনের ছেলেও ভালো জানে। আমি শুধু জানিনা
সুখের পাখির ঠিকানা কোন্ গাঁয়ে, প্রযত্নে কার নাম
ব্যক্তিগত না পিতার।

ছড়িয়ে পড়ে ভোর ভোর বেলা
উঠোনময় শরতের ফুল, কেঁদে গড়িয়ে পড়ে মাটিতে
চার বছরের জেদী শিশু, বায়না—হাতে চাঁদ এনে দাও।
এসব আমার কিছু নেই; শখ আছে
ন্যুইয়র্ক কিংবা আনারকলি থেকে
টুইডের একটা কোট বানাবার,
জেদ আছে নতি স্বীকার করানোর
যে আমার আজন্ম শত্রু, যার সঙ্গে প্রভুত্ব খাটানোর লড়াই
মুহুর্মুহু বাঁধে।

মিত্রপক্ষের সেনাবাহিনী আমাকে যদি গৃহবন্দী করে
আমার জানা হবে না
যথার্থ শত্রুকে ঘায়েল করার অন্ধিসন্ধি
খুঁটিনাটি গ্রামার।

আমার সারা শরীরে দমকলের ঘন্টা বাজে—আগুন লেগেছে
আগুন, পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে
আমার পিতৃপুরুষের দলিল,
আমার আইডেনটিটি কার্ড।

আমি শহর থেকে ছুটি নিয়েছি, চাকুরি থেকে ইস্তফা,
বউ-এর থেকে তালাক।

আমি এখন যাবো কোথায়?

বিনা কারণে সমুদ্রে (ভর শীতে) ঝড় ওঠে, জাহাজডুবি হয়,
নিষ্ঠুর বৈরী তুলে ফেলে পাহাড় কন্দরে
রেলওয়ে লাইন স্লিপার,
ট্রেন দুর্ঘটনা পলকেই ঘটে যায়।

আমি মৃত্যু চাই না কিংবা হাফ-গেরস্তের মতো বেঁচে থাকা
তবু শামুকের মতো গুটিয়ে যায়
আমার মধ্যবয়সের শরীর।

আমি গন্ধ চাই বেলফুলের,

আমি বর্ণ চাই গোলাপের। কিন্তু
হুড়মুড় শব্দে আসে ভগ্ন দূত;
পোস্ট অপিসের লাল রং সাইকেল আমার গেটের সামনে
দাঁড়াও—আপনার টেলি ...।
'টেলি' এই শব্দটা শুনলেই বুকের ভিতর
শির শির করে ওঠে অর্থহীন ভয়।

সুখকরও হতে পারে, লটারীর লাখ টাকা, কাম্য
ট্রান্সফার প্রমোশন কিংবা আত্মীয় বন্ধু বান্ধব
কারো না কারো ওয়েডিং-গ্রীটিংস।

কিন্তু আমি যে বিদেশ যাবো।
করতলে লেখা আছে যৌবনে সমুদ্র-ভ্রমণ।
আপনি কি জানেন, জাহাজ কোম্পানীতে
কিভাবে খালাসী নেয়?
আপনি কি জানেন, কোন্ ঠিকানায়, কার নামে
দরখাস্ত পাঠাবো?

কেউ বলবে না

জ্যোৎস্না আর প্রেম নিয়ে ছল চাতুরী এ তোমার নয়।
তুমি তো বাধাহীন হেঁটে এসেছ পর্বত অবধি।
দ্যাখো, এইখানে হাটের হল্লা নেই। নির্জনতা কী বিষম
শরীর এলিয়ে শুয়ে আছে।
জ্যোৎস্না ও প্রেম এইখানে অনর্গল গড়ে তুলছে
শিল্পের স্বভাব সুষমা।
তুমি এইখানে একা হাঁটু মুড়ে বসো। শিশুর মত
হাততালি দাও। কেউ বলবে না, লোকটা পাগল।
তুমি হেতুবিহীন শ্রাবণ বৃষ্টির মত অবিরল কাঁদো।
কেউ বলবে না—লোকটা পাগল।

সংঘাতের অপেক্ষায় এবং তারপর

রাস্তার দুই ধারে দুই পুরুষ
এক প্রবলতম সংঘাতের অপেক্ষায় বিনিদ্র রজনী
পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো।
কাল সাইরেন বাজলে তারা যে যার ঠিকানায়
ফিরে যাবে।   অথচ ঠিক ফিরে যাবে বলে কেউই আসেনি।
সর্বনাশের ভঙ্গিমায় রুখে দাঁড়িয়েছিল
কিংবা বিক্রমে ছুটেছিল ঘর-বাড়ি, সাইকেল-রিকশ,
হঠাৎ হাওয়ার মতো বাস কিংবা লরী।
টেপ থেকে জল পড়ছিল যেন এই মুহূর্তে বন্যায় ডুবে যাবে
পৃথিবীর বাকি এক ভাগ স্থল।
বুভুক্ষু ফুটপাতবাসিনী রতিক্রীড়া ভুলে
মধ্যরাতের মণি থেকে আগুন ছড়াচ্ছিল, যেন এই মুহূর্তে
আগুন ঝলসে যাবে বিশাল স্কাইস্ক্র্যাপার।
অবশেষে কিছুই ঘটবে না।
রাস্তার দুই ধারের দুই পুরুষ
জল হয়ে জলের মতো গড়াতে গড়াতে স্থিরনিশ্চিত
নিজ বাসভূমে পৌঁছে যাবে কাল।

থামুন

সহাস্যমুখ,   জল আয়নায় ছায়া পড়ে
প্রবল ঢেউ-এ প্রতিবিম্ব টুকরো ছেঁড়া;
দেখুন চেহারা দেখুন,
নিম্নবিত্ত হিন্দু যুবা   ঠায় দাঁড়িয়ে মধ্যপথে।
প্রশ্নপত্র কঠিন বেজায়,
শব্দ উঠবে   কার জন্য প্রত্যাগমন?
অর্ধপথে
গোলাকৃতি নির্দেশিকায় থমকে আছে 'থামুন'।

উপলক্ষ ছাড়াই

উপলক্ষ ছাড়াই
আমার গ্রামের বাড়ীতে হ্যাজাক জ্বলবে সারারাত; গোল হয়ে চক্রাকারে বসে
বিনা নোটিশেই হরিসংকীর্তন করবে সোনাদাদা এবং অন্যান্য পাড়াপ্রতিবেশী।
ঘুমচোখ জেগে উঠবে সুখী কিশোব, বাচ্চা মেয়ে সাবিত্রী।

এখন কোনোদিন সারাদিন বৃষ্টি হলে
আমাব বুকের মধ্যে
আততায়ীর পদশব্দে জেগে ওঠে অমলিন স্মৃতি ঃ কচুপাতার বুক চিরে
কমলারঙের ফুল

যেন বেদনার মধ্যে সেই গান বেজে ওঠে যে গানের ভাষা আমি জানি না
যেন সেই অরণ্য ঘনিষ্ঠকণ্ঠে কথা বলে যে অরণ্য কখনো আমি দেখিইনি।
উপলক্ষ ছাড়াই
এইভাবে বিনা নিমন্ত্রণে এক একদিন হাজির হয় গ্রামের বাড়ী।

সে আসছে

সে আসবে
তার
গোয়েন্দা শরীর
তার
সতর্ক হাত, মাপা পদক্ষেপ
স্পষ্ট হচ্ছে।

দুগ্ধফেন পর্দায়
ক্রমে
দৃশ্যগ্রাহ্য হচ্ছে
মরুস্থলী
উট
আর ফেলুদারূপী সৌমিত্র

সে আসবে
ঝড়, এইবার কি
সত্যি সত্যি ঝড় উঠবে?
ভাঙবে
ফ্রেমে বাঁধানো
রবীন্দ্রনাথ?

সে আসছে
আমার
শিরা-উপশিরা জুড়ে
টগবগ করছে
বুনো মহিষের রক্ত।

সে আসছে
তাকে
স্বাগত জানাবো,
এসো, এসো হে
অবলীলায় খুন করো
আমার এই
অযোগ্য শরীর।

চাই এক প্যাকেট সার্ফ

আমার শরীর ও বাগানের আবর্জনা দূর করতে
চাই এক প্যাকেট সার্ফ।
যেখানে গিয়েছি
এনেছি শহর ও গ্রাম পুড়িয়ে ছাই, বেমানান প্রেমিকার
থেকে ঘৃণা।
ইতর—আসলে আমি তা-ই,
যে দেখবো ব্রহ্মপুত্রের বিস্তৃত চবায় মবশুমী জীবন
প্রকৃতপক্ষে আমি অমন মানুষই নই।
লাল পাথরের কেচ্ছা শুনে রোমকূপে স্পন্দন উঠবে
আমি অমন হরিদাস নই কিংবা ভূবনসোম দেখে
সিটি বাজাবো অমন আঁতেল।
অনেক আবর্জনা সৃষ্টি করেছে চৈত্র, দোসব বসন্তের
আমি অনুগত।
কার পাপে নিরবচ্ছিন্ন ষড়যন্ত্র, চমৎকার বাঘবন্দী খেলা
কিংবা কার পাপে নষ্ট হল ব্যক্তিগত বোধ—
অমন কূটতর্কে স্পৃহা নেই।
শুধু জড়ো করেছি
হাট-শেষ রাত্রিবেলায় ছড়ানো ছিটানো ছেঁড়া কাগজ,
টুকরো বিড়ি, পচা বেগুন টম্যাটো আর
সর্বোপরি মানুষের ঘৃণা।
এখন প্রয়োজন বড়, বাড়ছে রোদের বিস্তার। এখন
চাই, আমার
চাই এক প্যাকেট সার্ফ।

সামনেই লামডিং

কোনো জানোয়ার—হাতি কিংবা চিতা শুয়ে থাকতে পারে
এই বকম গহ্বর ছেড়ে হঠাৎই সামনে অর্ধবৃত্তাকার দিয়াংব্রীজ।
তাব সুউচ্চ, মরা বক্তেব মতো লাল শরীরময় গম্ গম্
ধ্বনি ওঠে। বলে,—দ্যাখো হে, আমি ব্রিটিশ ছিলাম।
অহংকাবী পাইথনেব মতো নাতিদীর্ঘ অলস রেল
মাইগ্রেংডিসার ক্ষুদ্র স্টেশনে ইন করে।
আমাব ডানচোখে কৌতূহলী বড়াইল। নীচে অলস ভূখণ্ড জুড়ে
বুনো উদ্ভিদ ও একপাল মহিষের পিঠে পাহাড়ী রোদ
আলগোছে শোয়।
মধ্যপথে বসতির চিহ্ন নেই। নির্জনতার মূর্ত ক্যানভাসে
আধডজন সশস্ত্র সেপাই যুদ্ধং দেহী দাঁড়িয়ে থাকে, দাঁড়িয়েই থাকে।
পাথরে খোদাই বয়স্কমুখে দুঃসময় স্তব্ধ হয়ে আছে। বৈরী ডিমাসা
আনাচকানাচ কোথাও কি অপেক্ষমান?
অন্যত্র সৌখিন যুবা। নিতান্তই লাইনম্যান। হাতে সবুজ ফ্ল্যাগ।
যেন আকাঙ্ক্ষাবিহীন যৌবন দম দেওয়া পুতুলের মতো
ছাড়পত্র দ্যায়।
মিকির রমণীর পিঠে বাচ্চা ও টাটকা আনাজ। ভিড় করে তড়িঘড়ি ওঠে।
অদূরবর্তী মাইবাং স্টেশনে আজ সাপ্তাহিক হাট।
অহংকারী পাইথন, ধীরগতি এই ভাবেঁ ছুটে যায়। গম্ গম্ ধ্বনি ওঠে।
রোদ ভারি। অনুমান স্পষ্ট হয় সামনেই লামডিং।

□

দৃশ্যপট

কাজিবাঙার রিজার্ভ ফরেস্টে পিঠের উপর কৌতূহলী যুবা,
রাজকীয় ভঙ্গিমায় হেঁটে যায় হাতী। খুব কাছেই
তিতির হরিয়াল কিংবা অন্য কোনো পাখি উড়ে যায়
আচম্বিতে, কেউ কি এলো?
টেলিগ্রাফের তার শূন্যতায় অতঃপর ডিগবাজি খায়।
এই ভাবে তৈরি হয় প্রাকৃতিক দৃশ্যপট।
এই সব ছেড়েছুঁড়ে
আমি আর সমুদ্রে যাবনা, গৃহকোণে মানুষী হব না।
আপনিই বলুন জগদীশবাবু, প্রেমের বিকল্প কিছু
আছে কি? অথবা উল্লিখিত দৃশ্যের?
যদি বলেন, তুমি সুখ খোঁজো অন্যত্র কিংবা মানুষের কাছে।
আয়নায় বিম্বিত বোদ ঝলসে দেবে প্রেমিকের চোখ।
আমি আর আয়না দেখব না।

দেখুন হাসপাতালের দৃশ্যপট ঃ ইনকিউবেটারে রেকর্ডের মতো
কান্না বাজে। মায়ের উদ্বিগ্ন মন ইতিউতি চায়। সাদা পোষাকে
পরীর মতো করিডোর থেকে ওয়ার্ড
সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় নার্স।
ডাক্তারবাবু, আমি কি ভালো আছি, যেমন ভালো থাকে
বিজ্ঞাপনের সুবেশ তরুণ, শো-কেসে উজ্জ্বল তরুণী?

দৃশ্যপট পাল্‌টে যায়।
আমি কি সুখে আছি? কোষ্ঠীতে লেখা আছে
তিরিশের পর থেকে সুখ ও সমৃদ্ধি।
একবর্ণও মিথ্যে বলেনা মহারাজার নিজস্ব গণক। আমিও
মিথ্যে বলবনা। শুনুন জগদীশবাবু আমি ভালো নেই।
আমি ভালো নেই।
সাম্নেই প্রশস্ত পথ জুড়ে ত্রিপুরার রাজবাড়ী।
যেমন ফ্রিজে শীতল হয়, ভালো থাকে স্মৃতি—লোকে বলে
ঐতিহ্য।
আছে নির্বিকার পাথরের ছবি। আছে বর্ণহীন
নিরুত্তাপ দিন। প্রজাতন্ত্র দিবসের চিত্রিত হাতি, তোর পিঠে
রাজার দৃপ্ত ভঙ্গি ছবি হয়ে থাকে।

দৃশ্যপট পাল্‌টে যায়।
আমি আর অরণ্যে যাবনা। আমি আর শহরে যাবনা।
মনে মনে অন্ধ যে তার জন্য স্কুল কেন? কোনোদিন আমি তো
চক্ষুষ্মান হবো না আবার।
কেউ যদি ডেকে যায় ওহে পীযূষ শোনো, চেয়ে দ্যাখো
সাম্নেই সমুদ্রের বিশাল বিস্তার
অন্ধের হাতি দেখা?
আমি আর দেখবনা পৃথিবীর অন্য মুখ। মনে মনে
দৃশ্যপট তৈরী হয়ে আছে।

স্যার, আপনার টেলিফোন

ঘুমে কিংবা জাগরণে
যখন তখন
বেজে ওঠে ভৌতিক টেলিফোন।
বাচ্চা বয়সে সবুজ রেলগাড়ি চড়ে প্রথম যখন শহরবাসী হলাম,
দেখে কৌতূহল-ভালোলাগা, ভালোলাগা-কৌতূহল
ছলচ্ছল শব্দে হাসতো।
টেলিফোন, এখন আমার যখন মধ্যবয়স,
মুহুর্মুহু বাজে—বেজে বেজে যায়; শব্দে
আমার ড্রইং রুমের দেয়াল ফাটল ধরে, বটগাছের চারা
অসম্ভব দ্রুত বড় হয়, জমা হয় বিরক্তির পর বিরক্তি।
স্কুলে গেলেই
ছুটে আসে পিওন নসুরাম—'স্যার, আপনার টেলিফোন।'
ছুঁড়ে মারি ডাস্টার, নসুরামের কপাল ফেটে রক্ত।
রক্তে হোলি খেলে আমার ক্রোধ।
পরের দিন কমনরুমের পর্দা ঠেলে
নসুরাম পুনশ্চ হাজির—'স্যার, আপনার টেলিফোন।'
ভৌতিক টেলিফোন নাজেহাল করে একটা নগণ্য মানুষকে।
—'হ্যালো কে? কে? কে?
নিরুত্তর।
—হ্যালো।' ... 'হ্যালো' ... দূর থেকে কোনো কণ্ঠই ধ্বনিত হয় না।
রিসিভার শক্ত মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে
দ্রুত ছুটে যাই ক্লাসরুমে।
নসু, ভগ্নদূত, পুনশ্চ হাজির—স্যার, আপনার টেলিফোন।'
বিটোফেন, আলাউদ্দিন কেন যে তোমরা টেলিফোন নির্মাতাকে
একটা সুর দিয়ে গেলে না!

আজ বৃষ্টি

আজ বৃষ্টি।
সারাদিন বৃষ্টি। তুলকালাম বৃষ্টি।
বৃষ্টির ভিতর সোনার উজ্জ্বল গহনা পরে
কে তুমি অধিকতর বৃষ্টির দিকে
সুনির্দিষ্ট পা
লক্ষ্য স্থির পা, কে তুমি?

কে তুমি আবরণ-উন্মোচিত দেখাও রূপ, অন্য রূপ
গহনার অতিরিক্ত অন্যরূপ, কে তুমি?
দৃষ্টি ফেরাও একজন বন্দীর দিকে, একজন বন্দী
বড় কষ্টে আছে।

একজন বন্দীর থেকে যৎসামান্য দূরে তুমি, কে তুমি?
ক্রমশ দূরত্ব বাড়ছে ... ...। তুমি যে-ই হও, আর নয়, থাম।
তোমার ঘুঙুরের শব্দে, কঙ্কনের শব্দে
একজন বন্দী পাগল হয়ে যায়।

আজ বৃষ্টি
সারাদিন বৃষ্টি। তুলকালাম বৃষ্টি। গ্রীষ্ম,
যুবক গ্রীষ্ম এখন বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়েছে ঐ দিকে,
যেদিকে উন্মুখ শ্রাবণ
সারাদিন ঝর ঝর উপুড়, জলের শব্দে
ডুবে যায় সব কোলাহল। আজ বৃষ্টি।
সারাদিন বৃষ্টি।

গারো হিল্‌সের গল্প শুনে

গারো হিল্‌স থেকে
কোনো এক জংলি নদী—কী নাম, কী নাম—
নাম তো জানিনা।
ক্যাঙ্গারু বাচ্চার মত লাফিয়ে লাফিয়ে
পাহাড় থেকে পাহাড়ে
টিলা থেকে সমতলে ছোটে।
তার বুকের ভিতর পাথর-পাথর হাজার পাথর।
আনাচে কানাচে
মাছেদের নিরুপদ্রব সংসার। মাছ? কী মাছ?
নাম তো জানিনা।
দীপক, দীপক দেব তুমি তো বহুদিন গারো হিল্‌সে ছিলে।
নাম জানো সেই সে নদীর?
নাম জানো সেই সে মাছের?

খাও

ক্যাপসুলের মত গিলে খাও। বিরক্তি খাও ভালবাসা খাও
টানা তিনমাস খাও। তাহলেই
চিচিংফাঁক কারেন্সি নোটের নতুন গন্ধে ফিরে পাবে
তাগড়াই যৌবন।
হস্তান্তর কর সুখ ও অভাব। হস্তান্তর কর লোভ ও নির্লোভ।
স্বাধীনতার ঘোড়া গুলিতে হত হলে
বিশ্বস্ত গোলাম—ঘাড় গুঁজে পড়ে থাক। এবং
বিরক্তি খাও। ভালবাসা খাও। ক্যাপসুলের মত গিলে খাও।
টানা তিনমাস খাও। দ্যাখো, নিরাপত্তা অবশ্যই
অনুগত হবে।

সমাধি ফলকে লেখা থাকবে

উচ্ছৃঙ্খল জনতা
তোমাদের সমাধি ফলকে লেখা থাকবে ঃ
শুক্লপক্ষে তাদের মৃত্যু তাদের যথার্থ বয়স
বড় কম ছিল, তারা জ্যোৎস্না বলতে আঁধার বুঝেছে
তাই বলে তারা ডাকাত ছিল না।
ঈশ্বর, পুনর্জন্মে তাদের সুখ দিও, দিও শৃঙ্খলাবদ্ধ
সুস্থ জীবন, দিও পর্যাপ্ত সোহাগ
এবং বর্ণ বিহ্বল কয়েক হাজার জ্যোৎস্না।



জন্মজুয়াড়ী

অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ : ডাকবাংলো রোড : মেদিনীপুর
প্রকাশকাল : ১৯৯৫

উপলক্ষ

বহুদিন পর ক্যাসেট রেকর্ডারে
হেমন্ত মুখুজ্যে পুনশ্চ তুমি। তোমার সেইসব বিখ্যাত গানের অনুষঙ্গে
উত্তমকুমার তুমিও পুনশ্চ।
তোমাদের অবিস্মরণীয় মুখ আমাকে বহুকাল পর নিয়ে যায়
চাতলাভ্যালির উজ্জ্বলতায়।
জলসার পুল থেকে বড়জালেঙ্গা। বড়জালেঙ্গা থেকে
রোজকান্দি। অথবা উলটোপথে ধোয়ারবন্দ থেকে হাইলাকান্দি
সর্বত্র সেই অবাকভ্রমণ। প্রলম্বিতকাল তবু অস্পষ্ট করে
বন্ধুদের মুখ। অস্বচ্ছ স্মৃতির ভিতর ধানমাঠের লৌকিক ঘ্রাণ,
শীত-কুয়াশায় আচ্ছাদিত চা বাগানের দেহাতি যাত্রা কিংবা
ঝিঝিদের অমল জ্যোৎস্নারজনী হঠাৎই উপস্থিত হয়। আর
বারংবার তুচ্ছ করে বর্তমান দিন।
হেমন্ত মুখুজ্যে তুমি এই অর্ধবৃদ্ধ আমাকে আরো অধিক আনমনা কর।
সস্নেহ হাত রাখ অসুস্থ বুকে।

সেই মানুষটি

আমাদের মধ্যে সেই মানুষটিই হবে সাচ্চা। বৃহতেব ধর্মই
নিজেকে রৌদ্রের মতো বিস্তাব কবা। সে বিস্তাব কববে
তার প্রেম ও প্রকৃতি।
বলাবাহুল্য
কোনোদিন সেই মানুষটির, পৃথিবীর সবচাইতে সুখী মানুষটির
মৃত্যু হলে
পৃথিবীতে পুনর্বার সূর্য উঠবে না।
কথোপকথন শেষ হবে সেই তরুণীর—
যে কবিতার মতো কথা বলে।
বুকের মধ্যে একবারও বৃষ্টিপাত হবে না
সেই পুরুষের
যে ভালোবাসা জানে।
আমাদের মধ্যে সেই মানুষটিই হবে সাচ্চা—বৃহতের ধর্মই
নিজেকে রৌদ্রের মতো বিস্তার করা। সে বিস্তার করবে
তার প্রেম ও প্রকৃতি।

বেদুইন সর্দারের রুক্ষতার অবয়ব নিয়ে

অচিরেই একদিন
বেদুইন সর্দারের পাথর রুক্ষতা অবয়বে
মরুভূমির ক্যারাভ্যানের সম্মুখে গিয়ে
প্রসারিত হাতে দাঁড়াব।
ওরা ভয় পাবে।
ওরা ভয় পেলে হা-হা শব্দে প্রলয়ংকর গর্জনচল্লিশা
হেসে উঠব।
ওরা জানে না অভিনয়ে আজন্ম দক্ষতা কতটা মিশে আছে
রক্তে।
বয়স যতই হোক, অদ্ভুত কৌশলে লুকিয়ে রেখেছি
বুকের অসুখ, বেশকিছু কাঁচাপাকা চুল।
ভাদ্র-রোদে ঝাঁঝাঁ করছে বালি। যতদূর দৃষ্টি যায়
শুধু বালি আর বালি। ·
বালি তো বন্ধ্যা নারী। তার গোপন দহন আছে
তির তির দুঃখ আছে মনে।
সজ্ঞানে অস্বীকার করি তাকে।
অভিনয় এক নিদারুণ শিল্প হয়ে
চৈতন্যে দিয়েছে অন্ধকার মেঘ।
অচিরেই একদিন
বেদুইন সর্দারের পাথর-রুক্ষতা অবয়বে নিয়ে
মুখোমুখি হব প্রবল শত্রুর।

ফিরে যাওয়া

যেন স্বপ্নে কিংবা অর্ধজাগরণে
নীলচিল
সবুজ রেলগাড়ি অস্পষ্ট ধোঁয়ার মধ্যে কাঁপতে কাঁপতে
দূরান্তিক রেলব্রীজ, কুশিয়ারা নদী নদী জলে
ইলিশের দেহ থেকে রূপালি বিদ্যুৎ
জ্বলে ওঠে জেলেদের জালে।
এইভাবে ফিরে যাওয়া
অন্তর্গত দুঃখ নয়, দ্বন্দ্ব নয়, দাহ নয় কোনো। শুধু
এইভাবে ফিরে যাওয়া
নৌকো থেকে চোখে পড়া বিস্মৃতি ভূমির সেই
প্রাচীন মন্দির, জিলিপির স্বাদ
এখনো মনে পড়ে অম্লান।
শাহ্‌জালালের দরগায়
অজস্র কবুতর, সেখানে কি পালিত নির্ভর
মাছেদের দীঘি ছিল কোন।
স্বপ্ন না কি অর্ধজাগরণে
এইভাবে ফিরে যাওয়া,
এইভাবে বেঁচে ওঠা ভুল থেকে, মৃত্যু থেকে
তখন প্রচণ্ড কল্লোলে
ছুটে যায় নামহীন নদী
বহুদূর সমুদ্রের দিকে।

শ্রাবণকে ছুটি দাও

তোমার চোখে শ্রাবণ?
পটভূমি যেন তৈরি হয়েই ছিল। এইবার দেখে দেখে
কত কত সুখ। যেন মুহূর্তেই খুলে গেল বন্ধ দুয়ার।
এইবার যথার্থ সময়।
আমি আমার প্রতিপক্ষ পুরুষকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করতে
পারি।
তাকে আমি অবলীলায় হারিয়েও দিতে পারি।
তোমার চোখে শ্রাবণ?
তাই পান্ডুর চেহারা কত সহজেই মিলিয়ে গেল। না, দেবী,
শ্রাবণকে ছুটি দাও। পরিপূর্ণ ছুটি।

ত্রিপুরার মধ্য পাহাড়ে

জানুয়ারি পাঁচের বেলাশেষে
ডিজেলের পোড়া গন্ধে প্রায় বিপন্ন এই মধ্যবিত্ত কবির
দিন যায় মধ্যপাহাড়ে, রেল ইস্টিশনের একান্ত সমীপে।
কবির দিন যায় বড়ই মন্থর।

যেন হঠাৎই একসময় পাতাল ফুঁড়ে প্রাগৈতিহাসিক আঁধার;
গা-ছমছম ভুতুড়ে বৃক্ষের মত বিস্তৃত করবে অসংখ্য প্রশাখা।

কবি কি ভয় পাবে? বিনিদ্র প্রহরায় কেটে যাবে রাত?
লোকে বলে পাহাড়ী-আত্মা রক্তলোভে সাক্ষাৎ শয়তান।
কবি ভাবে, কতটুকু হারাব আমি?
সাধারণ ঘড়ি, সামান্য অর্থ কিংবা পিতৃদত্ত অনর্থ দেহ।

মধ্য পাহাড়ে, আঁধারে আসুক তবে অনন্য শয়তান!

একা দুঃখ

একা দুঃখ
নিভৃতে কথা বলে সারারাত। সাবারাত দুই চোখে
অসহ জাগর।
ইঁদুর, একটি ইঁদুর সারারাত ছোটাছুটি করে। ডর-ভয় নেই।
সব্‌জি মুখে টুক্ করে
আঁধাবে লুকোয়।
পদশব্দ শ্রুত হয়। শ্রুত হলে দরোজা হাট; প্রায় অলৌকিক
আলো-আঁধারি ছিন্ন করে
বাই-সাইকেলে আরোহী কে যায়
একা?
একা দুঃখ
জেগে থাকে সারাবাত। আসলে দুঃখ বড় স্বার্থপব বোধ।
সান্ত্বনা দ্যায় নিশুতি হাওয়া। দুঃখ
নিভৃতচাবী। কথা বলে সারারাত একা।

প্রিয় অন্ধকারে

এক হ্রদ প্রিয় অন্ধকারে তলিয়ে যাবার আগে
কোন্ মূর্খ সূর্যালোকে চোখ ঝলসে
                    হীন করে দ্যায়।
তুমি আমাকে অন্ধ করে দাও প্রভু। দাও অধিকতর
প্রিয় অন্ধকার।
আলো তো প্রেম নয়। সাক্ষাৎ অসুখ।
এক হ্রদ প্রিয় অন্ধকারে অন্তহীন জলে
মাছেদের সংসারে অতিথি হব।
আসলে আলো কিংবা প্রেম নামে অস্থির পাখি
দেশান্তরে পালিয়ে গেছে। অবশেষে
একদিন দেখি প্রসারিত হাত উপেক্ষার শীতে
সংকুচিত হতে হতে হাত নেই।
হ্যাঁ। হাত নেই। অবলম্বন চুরি হয়ে গেছে।
প্রিয় অন্ধকার জড়িয়ে আছে
                    চুল থেকে নখে।
বদলে গেছে পুরোনো দৃশ্যপট। এক হ্রদ প্রিয় অন্ধকারে
অন্ধকার, তুমি আছ প্রিয়তর হয়ে।

একটি স্বপ্নচিত্র

এক ধূসর স্বপ্নের ভিতর
শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটি খামারবাড়ি।
পাশেই দিগন্ত ছুঁয়ে ধানজমি। চারাধানের জমিতে ঢেউ ঢেউ
ছবি আঁকে মৌসুমী হাওয়া।

বাড়ির চতুর্দিকে প্রাচীন পরিখা। সবুজ গালিচার আস্তরণ পেরিয়ে
জলসাঘরের মত বিশাল ঘর।
বোঝা গেল পরিত্যক্ত এই বাড়িতে
নবাব নেই, নিদেনপক্ষে কোনো জমিদার।
বাঁশের নক্সা-আঁকা গ্রীল আড়াল করেছে গৃহাভ্যন্তর।
শুধু আলো-আঁধারের রহস্যময়তায় এক বুড়ো কৃষক চিত্রার্পিত
বসে আছে সুপরিসর দাওয়ায় একা।
বুড়ো, তুমি নবাবের সর্বশেষ জীবিত বংশধর?
বুড়ো, তুমি কি জমিদারের অভিশপ্ত উত্তর-পুরুষ?

অনুত্তর সময় দ্রুত বহে যায় প্রদোষের দিকে। কবে কোথায়,
কোন্ উপলক্ষে এই অদ্ভুত ভ্রমণ মনেই পড়ে না।
শুধু মনে পড়ে চারাধানের জমিতে মৌসুমী হাওয়ার
অসংখ্য ঢেউ আর বুড়ো কৃষকের চিত্রার্পিত জীর্ণ চেহারা।

জন্ম জুয়াড়ী

জন্মজুয়াড়ীর মত খেলে যাই সম্বৎসর আত্মঘাতী খেলা।
অথচ একদিন; বহুদিন আগে
কৃষ্ণচূড়ার রক্তলাল খোয়াইয়ের পথে ছিল
অবাক উত্থান। যেন অন্য কোনো অলৌকিক দেশে, সরলবর্গীয় বৃক্ষের বনে
ছিলুম দেহাতী পুরুষ। ঘরের দেয়ালে ছিল রামচন্দ্রের সংসারের
বহুবর্ণ ছবি।
সেই উদ্যান-স্থিত কুঁড়েঘর। সেই এক ও অনন্যা রমণী। লক্ষ্মণসম অনুজ
আর অভয়ারণ্যের তরতাজা দিন।

ভুল কল্পনায় দিন যায় দিনান্তের দিকে। আমি এই ৮২'র মধ্য পথে
পৌঁছে গিয়ে নির্ভুল জেনে গেছি—এক ভুল থেকে জন্ম নেয়
একশ কোটি ভুল, এক অকিঞ্চিৎকর ঘৃণা থেকে হত্যার স্পৃহা। এইভাবে
বারংবার জন্মজুয়াড়ীর মত মেতে উঠি
আত্মঘাতী বিনষ্ট খেলায়!

আরো বেশি বোবা

তার ভূবন বিখ্যাত উচ্ছ্বাস যা জলপ্রপাতকেও লজ্জা দিত
তার শিব্রামীয় কৌতুক যা মার্কিনী জোকস্‌কেও
পরাভূত করত
তার সেই ঘর-চমকানো অট্টহাস্য যা কুম্ভকর্ণের নিদ্রাকে
পলকেই ছিন্ন করত, সে
আজ বাক্‌শক্তিহীন। বোবা যুবক নিষ্পলক, যেন মৃত্যু
চেয়ে থাকে—চেয়েই থাকে। না, তার সামনে কোনো
নয়নাভিরাম প্রকৃতি নেই। কোনো
দৃশ্য নেই—অন্ধকারের কালো পর্দা ঢেকে রেখেছে
দৃষ্টিসীমার চতুর্ভিত তার।
ক্রম-আগত সূর্যালোক, মৌসুমী হাওয়া তাকে স্পর্শ করতে
ব্যর্থ হয়।
সে বস্তুত আরো বেশি বোবা আরো বেশি হিম হতে থাকে।

বেঁচে উঠি কোজাগরী রাতে

ম্লান স্বপ্নের ভিতর এ কোন্ কোজাগরী রাত? বাদামী ঘোড়া
দৌড়ে যায় অরণ্য পেরিয়ে অনন্তের দিকে।
এই অলৌকিক-প্রায় কালে তুমি আমার গোপন অশ্রু, দাও
আমাকে ফিরিয়ে দাও বর্ণগন্ধময় হারানো যৌবন।
এ যেন অচেনা এক প্রজন্মের গান, এক ঝাঁক উজ্জ্বল বন্ধুর মধ্যে
পাথর ছুঁয়ে দৌড়ে যায় জাটিংগার মত কিশোরী নদী।

জাগরণে অন্যরকম। ছোটলোক সম্ভাষণে একেকটি দিন আসে
দুর্মুখ শয়তান। অসহ্য, বড় অসহ্য এই রুক্ষ জাগরণ। যদি
ইচ্ছাপূরণ গল্পের অনুসরণে ফিরে পাই তাকে বেঁচে যাই
বেঁচে উঠি কোজাগরী রাতে।

একটি প্রাচীন চিত্র

দেশবিভাজনের ক'বছর আগে
কুশিয়ারার ঐপারে সবুজ ও হলুদের চিত্রাঙ্কনে সরিষার আদিগন্ত
প্রসারিত ক্ষেত একটি সাদাসিধে কিশোরকে উজাড় করে ঢেলে দিত
অকথিত সুখ ও বিস্ময়।
হঠাৎ কোনো কোনোদিন দূরস্থিত কলিকাতা বন্দর থেকে মালবাহী জাহাজ
কুশিয়ারার শান্ত জলে অশান্ত কল্লোল তুলে
সেকালের বন্দর-শহর শিলচরে যেত।
ঐ সময় মধ্যগাঙে উথালপাথাল ঢেউয়ের মধ্যে ভয়ংকর ডুবডুব খেলায়
মেতে উঠত দু'একটি দুঃসাহসী জেলেদের ছিপছিপে নাও।
কদাক্কচিৎ আজো কুশিয়ারার ঐ দুটো বর্ণময় ছবি কিশোর থেকে
মধ্যবয়স্ক হয়ে ওঠা পুরুষকে বলে,—কি গো মনে পড়ে
আমাদের কথা?

শ'কতক ঐতিহাসিক দিন

ছিল বটে কয়েকটি সৌর বৎসর তারুণ্যের উজ্জ্বলতায়
ছিল বটে শ'কতক ঐতিহাসিক দিন।
আমাদের সম্মিলিত রক্তে ছিল তাতার দস্যু। স্বপ্নে ছিল
অনন্ত প্রবাস। চোখে শত সহস্র মনীষার মুখ।

ছিল বটে বেশ কিছু অত্যুজ্জ্বল দিবস ও রাত্তির। ছিল বটে
চা-বাগানের সবুজে গন্ধে হৈ হৈ আড্ডা। সীতাংশুর বাড়িতে
সুধীন দত্ত অরুণ মিত্রের কাব্যপাঠ আর পাশাপাশি নিজ নিজ
সৃষ্টির অপূর্ব উল্লাস। ছিল বটে অঞ্জুদের বাড়িতে
স্বাধীনতার অপূর্ব আস্বাদ।

সময় এক দুর্দান্ত তস্কর। সময় এক নির্মম হন্তারক।
রক্তে এখন ভিজে বৃষ্টি কিংবা হিম-তুষার সারা দিন সারা রাত্তির
শুধু ঢেউ গোনা সমুদ্রে।

আশে পাশে কিংবা দূরত্বে ইয়ার-দোস্ত কেউ নেই। যে যার নিজস্ব
[illegible] নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। সীতাংশু উত্তর-চল্লিশেই মৃত।
[illegible] বাড়িতে গভীর জঙ্গল। এখনো কোনো কোনো দিন
[illegible] চোখ যায় মৃত্যুর দেখা জঙ্গলের দিকে।

কোনো কোনো সন্ধ্যায়

কোনো কোনো অদ্ভুত সন্ধ্যায় আলস্যের ভূত এসে বলে
বন্ধু হে, এসো, কিছুক্ষণ দাবা খেলা যাক।
বিছানা কিংবা চেয়ার থেকে দু'পা কিংবা তিন-পা হেঁটে
দরজা বন্ধ করব—এই নগণ্য শ্রমটুকুকে মনে হয়
একজন শ্রমিকের টানা বারোঘন্টার শ্রম।
ওদিকে দ্যাখ, জানুয়ারির বদমেজাজ ঠাণ্ডা হু হু শব্দে
ঢুকে পড়ছে ঘরে।
কোনোকিছু ভাবতেও ইচ্ছে করে না। ভাবনার দরজায় স্থির পেন্ডুলাম
ঝুলে আছে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুরক্ষিত তালা। আসলে
সুখ কিংবা দুঃখ, না-সুখ কিংবা না-দুঃখের সমীপবর্তী
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াহীন ঝুলে আছে অকেজো মনন।
কোনো কোনো অদ্ভুত সন্ধ্যায় আলস্যের ভূত এসে বলে
এসো হে, অলৌকিক দাবার আসরে শুধু তুমি আর আমি।

তোমাকে

তোমার মধ্যে এমন কিছু একটা ছিল নব্বুই বছর পর হঠাৎ দেখা
ধূমকেতুর মত ভয়ংকর প্রিয়, যা কিনা আমার একশ'এক বান্ধবীর মধ্যে
একজনেরও ছিল না।
প্রথম প্রতারণার পর জলপ্রপাতের গম্ভীর শব্দে
বুকের ভিতর হিমশৈল ভাঙতে থাকে। চরম দুর্ঘটনার প্রাক্‌মুহূর্তে তোমার।
সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিপাতে আর কোনো পতন নয়, ভাঙচুর নয়—আমি পার্থিব
তৈলচিত্রের মত স্থির হয়ে গেলুম।
সখি, আমি তোমার জন্যই পরশ্রীকাতর হাজার হাজার
প্রতিবেশীকে বিলিয়ে দিলুম হৃদয়। তবুও তুমি নিরবচ্ছিন্ন আশীর্বাদ নাও,
অভিশাপও নাও। তুমি আসলে কার উপমা বুঝতে না বুঝতেই
পাক ধরল চুলে।

জনৈক পিতার

তোর এতো অসুখ কেন বল্‌তো পিকু?
দেখতে দেখতে তেরো বছরের কিশোর হয়ে গেলি
তবু মা-বাবাকে কষ্ট দেবার বাজে অভ্যাসটা তোর
আজো গেল না!
ওদিকে দ্যাখ্‌, হা-ভাতে পুরুষ কিশোরীলালের
বড় বেটা তোরই সমবয়সী, কেমন অক্লেশে
সিনেমাহলের আশেপাশে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে
টিকিট ব্ল্যাক করে।

বলছি না তোরও ব্ল্যাকার হওয়া উচিত ছিল।
বলছি না তেরো বছর বয়সে তোরও বিড়ি খাওয়ার
অভ্যাস করা উচিত ছিল।
কিশোরীলালের ছেলের অসুখ করে না। কালো
বেড়ে ওঠা ছিপছিপে শরীরে দেহাতী কিশোরের
উজ্জ্বলতা আমাকে লোভী করে তোলে
দুঃখী করে তোলে।

উনকোটি বেলকুম থেকে

পাখি কিংবা ফড়িং কিংবা অন্য কোনো পতঙ্গের মতো
উড়ে আসছে উনকোটি বেলকুমের নিহত উদ্ভিদের
দেহাবশেষ, ছাই-ভস্ম ইত্যাদি
উনকোটি বেলকুমের দাবানল শহর ধর্মনগর থেকে
চোখে পড়ে না। অনুমিত হয় হেমন্ত শীত ঋতুতে জ্বলে উঠছে
অনুল্লেখ্য লিলিপুট পাহাড়।

পশ্চিমের কৈলাস শহর থেকে একসময় সারারাত চোখে পড়তো
সেই সে আগুন। হাজার মশালে সুসজ্জিত আদিবাসী
যোদ্ধাদের ক্রোধ কি-না বোঝা যেত না।
এখন, এখানে স্কুলবাড়ির ঘেরা চত্বরে সবুজ ঘাসের জমি
কালো হচ্ছে ক্রমে। আকাশের চেহারা রাগী না-কি বিষণ্ণ
বোঝাই গেল না। উড়ে আসছে নিহত উদ্ভিদের দেহাবশেষ
ছাই-ভস্ম ইত্যাদি। জ্বলছে
লিলিপুট সদৃশ উনকোটি বেলকুম পাহাড়।

বর্নি ব্রিজ থেকে চাঁদ

হঠাৎই তিনলাফ—
কে তুই? ক্যাঙ্গারু না ছেঁড়াখোড়া মেঘেঢাকা
চাঁদ—অস্থির চাঁদ!
আকস্মিক আমাকে দেখাবে বেআব্রু শরীর—চাঁদ তুই
নদী সাঁতরে, বহুদূরে বর্নি ব্রিজ থেকে গেঁয়ো গাড়ির সঙ্গে
সমানে পাল্লা দিয়ে,
এই দেশে, আমারই শহরে
অসময়ে আজ!
তোকে কী দেব?
তিড়েগুড় নাকি বাসিফুল?
আমার যে আগ্রাসী দুই চোখ অন্ধ হয়ে গেছে।
আজ বহুদিন
এইভাবে অন্ধ হয়ে
স্বকৃত নির্বাসনাবাসে
দৃষ্টিহীন বন্দী হয়ে আছি।
বরং উলটো পথে হঠাৎই তিন লাফ—বর্নি ব্রিজ
ফিরে যা, ফিরে যা যথাস্থানে তুই।

অনন্তের দিকে

মেঘে ও শূন্যতায় শুয়ে থাকে নারী, অর্ধসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি
এবং অভিধানের পৃষ্ঠাবদ্ধ শব্দ ও শব্দার্থ।
কিছুতেই তাকে নামানো যায় না স্কন্ধ থেকে, কিছুতেই
আলস্যের ভূত ছাড়ে না শরীর। শুধু নির্বকল্প ব্যর্থতা
কুরে খায়, অদৃশ্য পোকার মতো, খায় মেধা ও জীবন।
সহবাসে যায়
গড্ডলিকা স্রোতে ভাসমান নির্ভার দেহ, যেতে থাকে
অনন্তের দিকে।



প্রিয় কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত পঙ্‌ক্তিমালা

সাহিত্য : কলেজ রোড : হাইলাকান্দি
প্রকাশকাল : ২০০১

বরাক

—এমন সংবাদ
দাঁড়ের শব্দে উথলে উঠে বরাকের জল 'কে হে' পরাক্রান্ত শব্দে
প্রতিধ্বনি তুলে সমূহ বৎসর এক
নিদারুণ ঝড় গেলো ঃ বরাকের ব্রিজে অদূর শিলং কাঁদে,
বিচ্ছিন্ন ভূগোল জুড়ে শীতের শরীর, প্রতিবাদে
আমার স্বপ্নের থেকে
ঘনতর মৃত্যু নিয়ে ক্ষিপ্ত বরাক —দূরে —
গভীর শঙ্কায় জোয়াই নীরব।
—এমন সংবাদ
অর্ধনির্মিত বরাকব্রিজ —বহু নীচে
জলের আবর্তে ঘিরে পরিতাপশোকহীন চাঁদ থেকে
প্রবল ধ্বংসের আলো অসংযত অভিলাষে
ধ্বংস করে প্রত্যাখ্যাত মুখ —
আশ্চর্য বরাক।

মধ্যরাত হার্মাদ তস্কর

উদাসীন জ্যোৎস্নায়
সে
রহস্যময় সঙ্গীত হয়ে বেজে ওঠে
তবু
মধ্যরাত হার্মাদ তস্কর।
কথা বলে
লাল গেলাস হাতে অস্বচ্ছ মানুষ।
যেন
চাবি হাতে
তড়িৎগতি সাবলীল হাত
খুলে দিতে পারে কঠিন দুয়ার।
ঘুণ পোকা
তবু
অদ্ভুত জটিল শব্দে
নিয়তই কাজ করে যায়।
মধ্যরাত হার্মাদ তস্কর।

সাত বছর সময়

সাত বছর সময়
একটা গোটা জীবনে কম নয়। ছিল রাম রাজ্য।
শস্যশ্যামলা মাঠে দাঁড়িয়ে
মুখে জয়োল্লাস, গোঁফে তা দিতো মাধো সিং।
নারীকণ্ঠে প্রাণোচ্ছল হাসি
কল্লোলিত হতো নদী নির্ঝরে
কূপে
টিপকলে।
অনেক গ্রামগ্রামান্তর
এখন এই সাতবছর পর ফুলবাবু সেজে
পকেটে প্লাসটিক-চিরুণি হাতে চার্মিনার
সিনেমায় যায়।
তাহলে কে বলবে —ছিল যা' এখনো আছে।
তবু কোনো কোনো দৃশ্য অবিকল
অনাদৃত আছে।
পেন্ট-পাতলুন পালটে
এখনো সেই কণ্ঠস্বর, সেই চোখ সেই
একই মেদবহুল কিংবা মেদহীন শরীর, যেন
নির্মোহ সন্ন্যাস, বলে —
ছিলাম যা' এখনো আছি।
সাত বছর আগে
ঠিক এই দিনটিতে ছাদনাতলায় গিয়েছিল
এক সৌখিন যুবা —ছিলো, বিস্ময়কর জল ছিলো
চোখে, যেন রৌদ্রকরোজ্জ্বল জমি জুড়ে
হঠাৎ প্লাবন।
এখনো সে আছে।
ভূমিকায় রদবদল, খবা আছে, গুমোট আবহাওয়া,
খাই খাই শূন্যতা বিষম।
রাগে-দুঃখে, নখে-দন্তে ছিন্ন পোষাক —
পরিবর্তিত কিংবা অপরিবর্তিত
সাত বছর সময়
একটা গোটা জীবনে কম নয়।

চল্লিশোর্ধকালে

অরণ্যের প্রমত্ত প্রণয়
বহুকাল অবোধ্য ছিল। তিন তিনটে মূর্খ দশক
এমনি এমনি শেষ হয়ে গেল।

চল্লিশোর্ধকালে ভেসে উঠছে দ্বীপ
এতকাল অনিশ্চিত ছিল।
রেলগাড়ি, ট্যুরিস্টকোচ, তুখোড় গাইড —এহো বাহ্য
তার কাছে যাব বলে
চুলে রঙ —তৈরী হচ্ছে বোধ।

ফিরে যাবে নদী

অস্বচ্ছ হতে থাকা সেই বালক-বয়সে ফিরে যাবে নদী।
সে জানে না তখন স্বপ্ন ছিল কিছু, অথবা পাথর বহন করে
আঘাতে আঘাতে রক্ত-উৎসারিত দেহ
তবু সমুদ্র অভিমুখে বড় দূরবর্তী পথ।
বালক বয়সে ছিল না অদৃশ্য অসুখ, ছিল না প্রোজেক্ট-বন্ধন, ছিল না
ডহর-গভীরে রহস্যের ভয়াল জটলা।
তবু ফিরে যাবে নদী। বালক বয়সের লোভ আকণ্ঠ বিস্তৃত
কুরে খায় গিলে খায় ধ্বংস করে অর্থ ধর্ম রাজনীতির করোটি কঙ্কাল।
চতুর্ভিতে স্বেচ্ছাসৃষ্ট অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হবে? হোক।
মুহুর্মুহু যুদ্ধ হবে? হোক।
বালক বয়সে কালা হোক অন্ধ হোক, নগ্ন পা ছিন্ন তনু
ফিরে যাবে নদী।

আশ্রয়

অরণ্যে যাব। গুহাচারী হব।
কেন হব?
চাই কৈফিয়ৎ?
কেন দেব?
প্রশ্নের পর প্রশ্ন হাজার কূট প্রশ্ন আমাকে—আমাব আত্মাকে
অঙ্কুশবিদ্ধ করলে, করতে থাকলে, নিশিরাতে
আহত জন্তুর মত আমি চীৎকার করি।
চীৎকার, নাকি দীর্ণ হাহাকার?
কে শুনবে?
কেউ নেই?
এক মশারির ভিতর শুয়ে আছে যারা?
বিসর্জনের প্রতিমার মত উলটো পিঠ
ছলকে তুমি নদী।
জল কি বিচলিত হল?
নয়?
তবু মৃন্ময় নই। তবুও ধরে আছি কান্না। শুধু
অলস-মন্থর হাতে   সাঁতরে যাই
তীর থেকে দূরে
সত্যি যাই?
সমুদ্র কি অন্তিম আশ্রয়?

ছাগল সাম্রাজ্য

দ্বিপদ মানব হয়ে
কার কাছে যাব?
মানুষের কাছে নাকি ছাগলের কাছে যাব ভাবতে ভাবতে
কিছু দ্বিধা
কিছু সংকোচ; তবে কি ছাগলের কাছেই যাব?
কেন নয়?
শ'টাকা কিলোব ছাগল তো এখন এইদেশে মহার্ঘ সম্পদ।

ক্রমাবলুপ্ত বলে
মানুষের জন্য শোকসভা করার চেষ্টা করলে,
সংরক্ষিত নগর তৈরীর পবিকল্পনা করলে, কিংবা
পদ্য লিখলে
শিং উঁচিয়ে তেড়ে আসবে ছাগল ছাগল আর ছাগল।

মানুষ যেন প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী।
ছাগলদের যাদুঘরে মানুষের পোষাকে ঢাকা
মানুষের করোটি কঙ্কাল দেখতে ফি-হপ্তায় ছুটির দিনে
ভিড় করবে বাচ্চা ছাগল যুবা ছাগল ধেড়ে ছাগল।

জলভ্রমণের স্মৃতি

যতক্ষণ চত্তিরের হাওয়া
মন্দ নয়, বরং খুব বেশি স্বাদু—বালাগঞ্জ হাওরের
ছলাৎছল ঢেউ ভেঙে নৌকো যায়
                    মাসিদের মামাদের বাড়ি।
অতঃপর চত্তিরের হাওয়া যখন বোশেখির ঝড়,
ভালো নয়, বরং মৃত্যুভয় খুব—বালাগঞ্জ হাওরের
মহাকাল—মহাদেব ঢেউ আছড়ে পড়ে দেহে।
আশ্রয়, আশ্রয় কোথায়? সামনে যে ডাকাতের দ্বীপ!

ছোট জালেঙ্গা ১৯৫৮

১৯৫৮ সালের কোনো কোনো রাত্রি
ফ্লুরোসেন্ট-জ্যোৎস্নার নীলাভ আলোয়
তৈরী করেছিল ধ্রুপদী ছবি। বাঁশবনের নিঃশ্বাস
দেহ ছোঁয়—এমন নৈকট্যে ছিল সীতাংশুর বাড়ি। সীতাংশু,
সীতাংশু পালের আলকাতরা-রঙ কেরোসিন টিনের
ছাউনি ঘেরা ঘরে কোনো কোনো জ্যোৎস্না-ঝরা সন্ধ্যায়
মাসে অন্তত একদিন ছেলে-ছোকরা কবিদেব প্রাণখোলা আবেগ
শব্দে অলংকারে
লক্ষ্মীছড়ার ঝিরঝির জলস্রোতের সহজ সম্পর্কে এক হয়ে যেত।

ছোটজালেঙ্গার সেইসব বিরল রাত্রি
চা-বাগানের অদ্ভুত মাতাল গন্ধে বুদ্ধদেব অরুণ মিত্রের
কবিতার অনুষঙ্গে নেশা ধরাতো
তরুণ-রক্তে আর, গা-ঝাড়া স্বাধীন ভাবনায়
পঁয়ত্রিশ বছরের দীর্ঘ সময়
ডাকাতের মত কেড়ে নিয়েছে আমাদের বহু বহু মূল্যবান সম্পদ।
আকণ্ঠ মদ গিলে বেহিসেবী সীতাংশু আজ
পাঁশুটে অ্যালবাম।
ফ্লুরোসেন্ট জ্যোৎস্নার বহাল স্বাস্থ্য
আজো আছে। আছে চা-বাগানের মাতাল গন্ধ। সমস্যার
তন্তুজালে আছি আমরা অনেকেই। তবু
কোথাও যেন ফাঁকি, নিরন্তর ফাঁকি
কোথাও যেন শূন্যতার শব্দহীন সমুদ্র-প্রান্তর
কোথাও যেন মেঘলা বিষাদ সমস্ত যোগসূত্র ছিন্ন করে
বলে, এইসব জন্মান্তরে ছিল।

জনৈক ক্রীতদাসের আত্মচরিত

ছোটবড়ো প্রতিটি অঙ্গের স্বাভাবিক বিদ্রোহকে
প্রবল উপেক্ষায়
শহুরে টেনশনে ঠেলে দিয়ে
যখন মাটিতে পা, সকালকে সকাল বলে
মনেই হল না
জ্যৈষ্ঠের উত্তপ্ত সকাল অপ্রাকৃত শীত-কুযাশায
ঢেকে রেখেছে চতুর্ভিত। যেন
ভোব ভোব বেলা। যেন অলৌকিক গোধূলি।
ততক্ষণে গলিব মোড়ে
চায়ের দোকানে গুচ্ছ গুচ্ছ জটলা।
আসলে
প্রৌঢ় এই দেহ যে শয্যা চায়, নিদ্রা চায
আবো। চায় আবো আরো
অখণ্ড বিশ্রাম।
ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি
ঋতু-নির্বিশেষে
একটা দৈত্যের মত 'কিন্তু' গলায় শেকল বেঁধে,
ডাকসাইটে বিদেশী কুকুর,
টানতে টানতে নিয়ে যায় পার্ক রোডে,
কলতলার ভিড়ে, অন্ধ থেকে আগত
অসহ্য বাজারে আর কর্মহীন কর্মক্ষেত্রে
প্রতিটি দুপুর।
তখনো অনবয়ব বিদ্রোহ
অদৃশ্য ভ্রূণে, অপক্ব বোধে ধোঁয়া হয়ে শুধু।

বেওয়ারিশ লাশ

যেন জেল ভেঙে
　　জেল ভেঙে মধ্যরাতে　　পাগলঘন্টি পাগল হবার কিয়ৎক্ষণ পূর্বেই
পালিয়ে গ্যাছে মহার্ঘ আসামী, নাকি সন্ত্রাসবাদী যুবা।
শহর তো নামেমাত্র। মহকুমা সদর। দুঃসংবাদ ঘরে ঘরে পৌঁছে যেতে
　　　　　　　　　　সাকুল্যে দশ মিনিট।
এখন শীত।
লেপ-কম্বল ছুঁড়ে ফ্যালে তড়িঘড়ি ঘুম ভেঙে উঠল আস্ত শহর
যেন সহসা সতেজ -
　　সহসা সতেজ মস্তিষ্কের কোষে কোষে আচানক আশ্চর্য তুফান,
　　　　　　　　　　অথবা দৌড়ে গেল রাণাপ্রতাপের ঘোড়া।
তাকে বাগে আনবে সাধ্যি কার? ভয় সুখে মাতাল পুরবাসী ভুলে গ্যাছে
　　　　　　　　　　দিনযাপনের গ্লানি।
যেন ক্ষুৎকাতর শকুন,
　　ক্ষুৎকাতর শকুন ঠোঁটেনখে ছিঁড়ে খাচ্ছে বেওয়ারিশ লাশ। কার লাশ?
আমজনতার কৌতূহলে হুমড়ি খেয়ে থানা প্রাঙ্গণে, হাসপাতালে
　　　　　　　　　　ভীষণ উৎসুক।

ঘোড়া বিষয়ক

ঘোড়া ১ঃ বিভূতি মুখুজ্যের রায়বাহাদুর ননীগোপাল চক্রবর্তীর মত
রেসকোর্সের তাগড়াই ঘোড়া কিনে আমার যুবক জমিদার বাবা
পরেরদিন মোড়ল আর্জান আলীকে নির্দেশ দিলেন—খদ্দের দেখো

ঘোড়া ২ঃ স-সংযুক্তা পৃথ্বীরাজের দুর্দান্ত ঘোড়া আমাব বয়ঃসন্ধির
নিষ্পাপ প্রেমানুভূতি। ইতিহাস ইতিহাস গন্ধের গল্প-পুস্তকের
প্রচ্ছদসূত্রে প্রাপ্ত এ অনুভূতি একালের সঙ্গে মানানসই
নাই-বা হলো! পঞ্চাশ উত্তর প্রাচীন ঘোড়া অনুষঙ্গে
শতশতাংশ সত্যানুভূতি বটে।

ঘোড়া ৩ঃ অধুনা পরিত্যক্ত কলাবতী টকিজে বঙ্কিমচন্দ্রের ঘোড়া
ঝড়-বাদলার পরিবেশে একাত্মভীষণ সত্য হয়ে বহু বহু বছর
মুগ্ধ করে রেখেছিল। প্রবল রহস্যের সেই সেলুলয়েড ঘোড়া
আঁপু চোখ আমাকে তন্ময় করে রেখেছিল এই সেদিনও।

ঘোড়া ৪ঃ কবি বিজনকৃষ্ণ চৌধুরীর কলেজটিলার বাড়ির ড্রয়িং রুমের
লাল-খয়েরি জলজ্যান্ত ঘোড়া যেন এক বিমল উজ্জ্বল
জেরক্স কপি আজো। ছবিটা কার আঁকা? ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ?
দুর ছাই। ঘোড়াটা বেচেবর্তে আছে তোফা;
শুধু শিল্পীই বিস্মৃত এখন।

ঘোড়া ৫ঃ ঘোড়া আমার নিঃশেষিত প্রায় অবাক যৌবন। নিঃশেষিত, কিন্তু
মৃত নয় মোটেই। ঘোড়া আমার ধারাবাহিক কল্পলোকের
এক চমৎকার উৎস। শুধু কোনো কোনো দুর্বল মুহূর্তে
আমার ঘোড়া তার গতি-বৈশিষ্ট্য ভুলে হয়ে ওঠে
কিয়দংশে গাধা।

তিন পয়সার অস্তিত্ব

বাকযুদ্ধ ছাড়াই জয় করে নেব—এরকম অদ্ভুত উদাসীন নৈপুণ্যে
ক্লীবকে ভুলে গিয়ে
কী ভীষণ সপ্রতিভ, নিশীথ রজনীতে মধ্যাকাশে দেখাব
সূর্যের বদরাগী মুখ।
নিশীথ রজনীতে গূঢ় ঘন স্বপ্নে আলেকজাণ্ডার, সমুদ্রগুপ্ত
স্বপ্নে ঐরকম অপরাজেয় হতে হতে
অবকাশের দিনে
যখন ঘরে,
তখন শিবিরে শিবিরে অন্ধকারের জটলায় নিঃসঙ্গ আমি এক
তিন পয়সার অস্তিত্ব, আমি এক ভিখিরি বুড়ো।

চাতলার মুখ

বামহাতে চা-বাগানের অনুচ্চ টিলাভূমির অনন্ত সবুজ। পাখি-পাখালির ভিড়।
ডানহাতে সর্পিল কুলি-লেন। মাটির ছোটো ছোটো ঘর। দেয়ালে
আদিবাসী চিত্রাঙ্কন আর মদমাতাল জ্যোৎস্নায় হরিপ্রসাদ হাজামের
নেশাজড়ানো কণ্ঠে মহম্মদ রফি।
ডানহাতে বাবুদের অসংস্কৃত কোয়ার্টার। ফাঁকফোকরে চারা বাড়ির
রহস্যময়তা। আরো একটু এগিয়ে চলো। বিশাল চা-ঘরের চতুর্দিকে
চায়ের গন্ধমাদকতায় গ্রীন লেভেল লিপটনও নিতান্ত তুচ্ছ।
শীত কুয়াশা কিংবা বৃষ্টির ধারাপাত আর আরো আরো ফিকে হতে থাকা
সুপ্রাচীন চিত্রমালা আছে কি নেই কে জানে। উনচল্লিশ বছর দেখা হয়নি
চাতলার চা-বাগানের মুখ।
চা-বাগান। কয়লা আর লাল সুরকির পথ, কুলি-লেন, বাবুদের
কোয়ার্টার, চারাবাড়ি আর সম্ভ্রম জাগানো ম্যানেজার সাহেবের বাংলো
হয়তো এখনো আছে। কীভাবে আছে কে জানে! হয়তো তারা
ভালো আছে। হয়তো তারা খুব একটা ভালো নেই।

পঞ্চাশের শিলচর ও অপু

বিচ্ছেদ উত্তর পঞ্চাশের ছোটো শহর শিলচব,
ক্লাস ফোরে পড়া হাফপেন্ট হাফশার্ট বালকেব বিস্মিত নয়নে
তুমি তো সাক্ষাৎ বোম্বাই।

প্রথম শহর দেখার কৌতূহল, ভালোলাগা বালককে করে তুলেছিল
বিভুতিভূষণের অপু।
সেই সময়
এই শহরে বুধবার বুধবার সাহেব-মেমের মেলা বসতো।
ছিল আঙুলে গোনা গুটি কতক চিনে পরিবার। বরাকের পাড়ে
ব্রিটিশ স্থাপত্যের একগুচ্ছ কুটির-এ যেন
টেমসের তীরে বিলিতি গাঁও।

পায়ের ঘুঙুর, হাতে বাঁশে বাঁধা ছায়াছবির পোস্টাব,
ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ শব্দ খেলার মাঠে, অপরিসর পিচঢালা পথে
চলমান বিজ্ঞাপন, আর চিনেবাদামের খোসা ভাঙতে ভাঙতে
টাউনক্লাব বনাম ইন্ডিয়াক্লাবের টগবগে উত্তেজনা। তারাপুর ধরে
ক্লাব-ঘরের পথে তরুণ সন্তোষমোহন, রাণাদার পেছনে পেছনে
খেলাপাগল বালকদের ভিড়।

পাগলের জীবনলিপি

জানুয়ারির এই দারুণ নির্জন শীতের মধ্যেও
ছাপ্পান্ন ইঞ্চির খৈতান পাখা বন্‌বন্‌ করে ঘুরতে থাকে। বাইরের
০ ডিগ্রির শীত-সর্বনাশ আর ঘরের ১০০ ডিগ্রির আগুন উত্তাপে
ভুলে যাই এই মাস, বারো মাসের বারো নামের বাইরে
হয়তো অন্য কোনো অদ্ভুত নামের
অদ্ভুত মাস।
রক্তচাপ ঠিক কত জানতে গেলে ড. কর বললেন—
আপনার সর্দিজ্বর।
লিমোলেট একটা করে তিনবার। ব্যস—আর কিছু নয়। তাহলে
অসচেতন ভীষণ। ভাতকে মুড়ি ভাবছি। মানুষকে দানব।
খালি পায়ে জুতো পরে, তার উপরে মোজা—এই যদি জীবনলিপি,
তোমরা আমাকে কী ভাববে? পাগল?

প্রায়ান্ধের কয়েক পংক্তি

চশমার কাচে এক ঝলক মেঘদিবসের রৌদ্র অথবা
মধুকবির সৌদামিনী অথবা পাহাড় শহরে
· শীত কুজ্ঝটিকা অথবা
শারদীয় মেঘ ও বালিকা'বৃষ্টি ঢেকে দিল দূরদর্শনের
চৌকোণো পর্দা, ঢেকে গেল দারাপুত্রের পারিবারিক
অ্যালবাম, রূপসী সুইজারল্যাণ্ড এবং ভীষণ প্রয়োজনের
সন ও তারিখ।
তবে কি অন্ধত্ব সমাগত-প্রায় ?
হিতৈষী পরামর্শ দিতেই পারেন জগন্নাথ ট্র্যাভেলসে
গুয়াহাটি চলে যাও।
শংকর নেত্রালয় তোমার জন্য অধীর উদ্বাহু অপেক্ষায় আছে।

গেছো ব্যাঙ

ইস্কুলবেলায়
'তোমার জীবনের লক্ষ্য' বিষয়ে পরীক্ষার খাতায় উত্তর পত্রে লিখেছিলি
—আমি টার্জান হব।
হতে গিয়ে অবশেষে
গেছো-ব্যাঙ হলি। হয়ে এ গাছ থেকে ও গাছ। কী বিষম তৎপরতা
গাছে ও জঙ্গলে। ক্রমে
অভ্যাস তোর স্বভাবদোষে বদভ্যাস হল।
পথিকের পিঠে পড়লি। ঘাড়ে পড়লি।
যাকে ছুঁলি সে চর্মরোগে হল সাক্ষাৎ পাগল। চর্মরোগ-বিশেষজ্ঞ
ডাক্তারের খোঁজে শিলচর হয়ে গুয়াহাটি। অবশেষে
ভেলোর কিংবা অ্যাপেলো।
টাকা গেল, বাড়ি গেল। পিতৃপুরুষের দেওয়া প্রাণও
যায় যায়।
রাজ্য থেকে রাজ্যান্তরে কোথাও
টার্জানের চিহ্নমাত্র নেই। শুধুই গেছো ব্যাঙ। কাতারে কাতারে
গেছো ব্যাঙ। চতুর্দিকে লঙ জাম্প হাই জাম্পের ইতিহীন
বিরতিহীন প্রতিযোগিতা।

খোঁজ

খোঁজার শুরু হয়েছিল সেই কবে
ক্লাস এইটে পড়ার বিপজ্জনক বয়সে। তারাপুরে,
আমাদের ভাড়াটে ঘরেরর ইস্কুল বালিকা নার্গিস, হতে পারে তুমিই আমার
প্রথম খোঁজ। স্মৃতি অনেকসময় মিথ্যে কথা বলে। আবাব নাও হতে পাবো।

পাশের বাড়ির বাল্যবন্ধু রাণার ছোটোমাসি সন্ধ্যারাণীর মুখেও
তোমাকে খুঁজেছি। এবারেও ভুল অন্বেষণ।

রোজকান্দি চা-বাগানের সুরকি ছড়ানো প্রান্তর ছেঁড়া একলা পথে
তোমাকে দেখেছি
পুরো শীত-গ্রীষ্মের একটি বছর। তৃষিত চক্ষু বৃথাই খুঁজেছিল, বৃথাই।

এলেনপুর চা-বাগানের পাড়-মাতাল টিলাবাবুর নিঃসঙ্গ আগাছা-নিন্দিত
কোয়ার্টারের রহস্যময়তায়, তার মোহন সংসারে খুঁজেছি তোমাকে।
তুমি ছিলে না তো! নাকি ছিলে?

রাজ্যান্তরে ভোরের ভ্রমণে, কলেজের পথে, চাঁদকে সাক্ষী রেখে
নির্জনের মেঠো পথে তোমাকে খুঁজেছি কত কতদিন। পাইনি।

দূরাগতা সেই কালো মায়াবিনীর মুখে তোমাকে খুঁজতে খুঁজতে
লাবক পেরিয়ে লক্ষ্মীপুর অবধি ছুটে গেছে দূরন্ত দুর্বার চোখ।

দেখতে দেখতে পশ্চিমের মাঠে ঢলে পড়ল বিষণ্ণ সূর্য। অদূরেই
শেষ রজনীর বিজ্ঞাপন। খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে
খোঁজামাত্র সার। তোমাকে পাওয়া গেল না
কোথাও, কোনো পৃথিবীতে।

ম্যাঁয় আজাদ হুঁ

ম্যাঁয় আজাদ হুঁ।
আমিই স্বাধীনতা। আমার হাতকে আমি খুশিমতন
রক্তে রক্তে লাল করেছি। সহোদরের রক্তে, বন্ধুর রক্তে,
পিতার রক্তে।
আমার হাতকে আমি কঠিন কঠোর নির্দেশ দিয়েছি—
আমান বুক ত্বকে আমূল বিদ্ধ কর ক্লাইভের খঞ্জর।
আমিই স্বাধীনতা। আমার হাতকে আমি বলেছি
আমার শার্টের বুক-পকেট থেকে ছিনিয়ে নে ছোট একটা
পাউরুটি কেনার সামর্থ্য।
মুখকে বলেছি রঙ মেখে সঙ্ হ তুই। অঢেল
মিথ্যা আশ্বাসে ভরে দে, ভরে দে আমার শূন্য হৃদয়।
দেদার স্বপ্ন দেখার সুদূরব্যাপী সর্পনেশায়
আমাকে তুই মাতাল করে দে।
আমিই স্বাধীনতা। আমি আমার পা'কে বলেছি
বেড়ালের মত নিঃশব্দ গতিতে ঢুকে পড় আমার
শোবার ঘরে।
সুরক্ষিত আয়রন [illegible] খুলে হাতিয়ে নে উত্তরাধিকার-
সূত্রে পাওয়া দলিল ও
দশ সহস্র মুদ্রার ইন্দিরা বিকাশ পত্র।
আমিই স্বাধীনতা। আমার ভ্রমণ বিলাসী পা'কে
নিজের হাতে শিকল-বন্দী করে বলব—এই হলো
লক্ষ্মণকৃত সীমারেখা। এর বাইরে কক্ষণো যাবি না।
আমিই আমার স্বাধীনতা। উধর্ব-পঞ্চাশ বছর আগে
আমার পিতা আমার নামকরণ করেছিলেন 'আজাদ'।
ম্যাঁয় আজাদ হুঁ।
আমিই আমার মনোহরণ স্বাধীনতা। হায় স্বাধীনতা!



শ্রেষ্ঠ কবিতা

মনোবীজ : ১১, জগন্নাথবাড়ি রোড : আগরতলা
প্রকাশকাল : ২০০২

ব্যক্তিগত শ্মশানের জন্য

ঐ লাল বাড়িটার পেছনে
আমি যৎসামান্য জমি কিনবো আমার ব্যক্তিগত
শ্মশানের জন্য, একমাত্র এটাই হবে আমার ব্যক্তিগত সম্পদ
তুমি আলোক,
আমার একমাত্র সন্তান, আমি দুঃখিত
তোমার জন্য, তোমার এই ৫ফুট ১০ইঞ্চি দেহ বাদে,
আমার বিধবা স্ত্রী এবং
তোমার এই পদবী বাদে আর কিছু দিয়ে যেতে
অক্ষম। কারণ, আমি বিশ্বাস করি,
একমাত্র দুঃখ ছাড়া আমার আপনজন কোনোকালে
কেউ ছিল না।
একমাত্র সুউচ্চ আকাঙ্ক্ষা ছাড়া অন্য কোনো অস্তিত্ব।
এই আমি,
ঐ লাল বাড়িটার পেছনে সাড়ে তিনহাত জমি কিনবো
ব্যক্তিগত শ্মশানের জন্য।

সেই সৈনিক

পথ আগলে
দাঁড়িয়েছিল সেই সৈনিক, যার দু'চোখে ছিল
এক বিরাট পাথুরে চশমা। তার পোশাক ছিল মহিষের
রক্তের মতো
গাঢ় লাল। তার গলায় ছিল ব্রীজ অতিক্রমকারী ট্রেনের
গমগম শব্দ।
তার রক্তে ছিল
দুঃসাহসী অশ্বের পাগলা পদধ্বনি। সে
স্বাধীন ত্রিপুরার প্রবেশদ্বারে হিমাদ্রির মতো তুষারকঠিন
দাঁড়িয়েছিল
সেই ব্রিটিশরাজত্ব অবধি।
এ'কথা হয়তো অনেকেই জানেন না,
তার সেই বিরাট পাথুরে চশমার আড়ালে তার দুটি কাককালো
চোখ ছিল। আত্মার ভিতর
ভালোবাসাময় বিশ্বাস ছিল। কেঁপে উঠতো হলুদরৌদ্রে
তার অরণ্য-প্রকৃতি। সে জানতো
ভালোবাসা ও বিবেকের যথার্থ মানে।

আত্মহত্যা বিষয়ক

আমার গ্রীবা জুড়ে জন্মগত
এক চিল্‌তে কালো দাগ।
আড়ালে আবডালে আমার পিতৃপুরুষ ব্যাখ্যা করেন ঃ জাতক পূর্বজন্মে
আত্মহত্যা করেছিল, এটা তারই চিহ্ন।

এই জন্মে আমি আত্মহত্যা করবো না।
আমি মনেমনে একটা বাক্য তৈরি করি, 'এই জন্মে আমি আর আত্মহত্যা করব না।
'আত্মহত্যা' এই অদ্ভুত শব্দটা মনে মনে উচ্চারণ করলেই বুকের মধ্যে
অসম্ভব হিম পড়ে, মুহূর্তেই
মুহূর্তের জন্য ঘড়ি, আমার নিজস্ব ঘড়িটা স্তব্ধ হয়ে যায়, ঘড়ি মানে
হার্ট, বঙ্গভাষায় হৃদপিণ্ড। তুমি—স্পৃহা থেকে যার
অনীহা বড়,
বলবে—বেঁচে থেকে কী লাভ রে তোর?
নিরুত্তর থাকি, আসলে কিছু কিছু মানুষ কিছুই বোঝেনা, মনে মনে বলি,
আছি
আমি আছি
অস্তিত্বের মোহে পাগল, বড় পাগল আমি, আমি হাজারবার উচ্চারণ করি
আছি
আমি আছি।
একটা প্রমাণ হাজির করা যাক, ধরো বাড়ি ফিরছি, কেউ একজন
ডেকে উঠল—পীযূষ, এই পীযূষ।
ধরা যাক, এই শহরে কেউ আমাকে চেনেনা, একটা পিঁপড়েও না।
পীযূষ হতে পারে একটা চায়ের দোকানের ছোক্‌রা, হতে পারে পূর্তবিভাগের
কেরাণী, এই বিশিষ্ট পীযূষ হয়তো আমি নই, অন্য কেউ,
তবু আমি উৎকর্ণ হলাম, দু-চার সেকেণ্ডের জন্য দাঁড়ালাম, ফিরে তাকালাম।
তার মানে
আছি
আমি আছি।
অস্তিত্বের মোহে বড় লোভ আমার, না, কোনো ভয়ংকর বিপর্যয়েও
আমি আর আত্মহত্যা করতে যাব না।

ভালোবাসা শব্দে

'ভালোবাসা' এই বহুল উচ্চাবিত শব্দের মধ্যে
একটা উদ্যান, একটা পুকুর, একজন পুরুষ, একজন নারী
খুব নিঃশব্দে এসে গোটা একটা ছবি তৈরি করে।
ছবি আরো তৈরি হয়
যেমন রেল ইস্টিশনের আকাশে শুধু কৃষ্ণচূড়া।
'কৃষ্ণচূড়া' এই বহুল উচ্চাবিত শব্দের মধ্যে জাপান থেকে ডাকযোগে
ছুটে আসা পত্রবন্ধুর রঙিন ফটোগ্রাফ, তাহলে সেখানেও কৃষ্ণচূড়া
নাকি ভ্রমবশে চেরীফুল।
তবু সত্যি সত্যি বদলে গেছে সুষমার মুখ, ফুলের রঙিন উৎসব
প্রমাণিত হয়ে গেছে আকস্মিক ভ্রম।
এরকম দৃশ্যে অনুমানে বেঁচে ওঠে মফঃস্বল শহরের চায়ের দোকানে
উপবিষ্ট রাগী ছেলে হুঙ্কার ছুঁড়ে বধির করে সেই নারীকে, না
নারী নয়, 'নারী' শব্দে তিরিশোর্দ্ধ মহিলার ছবি তৈরি হয়,
বলা ভালো, সেই মেয়েটিকে, যে ভালোবাসা এই বিশিষ্ট শব্দের
মানে জানে। হয়তো-বা জানে।

এই জন্মে না, পুনর্জন্মে

এই বয়সে, বয়স যখন চল্লিশ ছুঁই ছুঁই,
দমকা হাওয়া এসে উড়িয়ে দ্যায় টেবিল থেকে টুকরো কাগজ
দেয়াল থেকে সাতাত্তরের ক্যালেণ্ডার; তখন হঠাৎই কিছু একটা ঘটে যায়।
তুমি রূপসী নীলিমা তখন খুবই কাছে।—বলে ওঠো—এই তো আমি। তখন ঠিক তখনই
হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে হিমালয়, তখন নদীর উপত্যকা ডুবিয়ে হুম্‌হাম্‌ শব্দে ছড়িয়ে পড়ে
বন্যা। এবং তৎক্ষণাৎ জেনে যাই, ঐ প্রান্তে, লোকে যাকে পরিণতি বলে, কী আছে ধ্বংস না
স্থিতি।
তখন প্রচণ্ড হিম নামবে, ঝড়ো হাওয়া বইবে সারারাত। তাবা আমাকে টেনে হিঁচড়ে, হিংস্র
হিস্‌ হিস্‌ শব্দে নিয়ে যাবে সেই বধ্যভূমিতে, যেখানে গেলে আর কখনো ফিরে আসা যায়না।
তবু কুয়াশার মত নরম প্রণয়, গন্‌গনে আগুনের মত ধ্বংসোন্মুখ প্রায় অকৃপণ জেদে খালি
খালি বেড়ে ওঠে, লহমায় প্রশাখা ছড়ায় শূন্য থেকে শূন্যে।
রূপসী নীলিমা, আমার অসম্ভব ইচ্ছে হয়, তোমাকে নিয়ে কোথাও না কোথাও পালিয়ে যাই।
কোনো পাহাড়ী ইস্‌টিশানে, কোনো এক ভোরভোর সময়। সেখানে স্টেশানের কাছাকাছি ছোট্ট
একটা চা-বাগান, সান্নিধ্যে কুলিমজুরের ফসলের মাঠ।
হোক্‌ ভুল হোক্‌ প্রচণ্ড ভুল হোক্‌ অনার্য রক্তের নেশায় এখনো তারা ইচ্ছে করলেই উপড়ে
তুলে ফেলতে পারে ভিতর, তাদের কোনো গতকাল নেই আগামীকালও নেই।

চিত্রকল্প

১.

সহসা সতেজ মস্তিষ্কের কোষে, শোণিত-প্রবাহে দৌড়ে যাচ্ছে
অস্থির অশ্বিনী। শব্দ ভাঙছে পাহাড়।
তাকে বাগে আনবে সাধ্যি কার?
সে যাচ্ছে, আর ধূলিঝড়ে লোপাট হচ্ছে জনপদ

২.

বেওয়ারিশ শবদেহের মত পড়ে থেকে পড়ে থেকে
জল নেই হাওয়া নেই রৌদ্র নেই। পুলিশ আসার আগেই
বিশ্বস্ত গোলাম হয়ে আত্মা
দাউদ ইব্রাহিমকে তিন তিনবার
সেলাম ঠুকল।

৩.

এভাবেই
শত শত দুঃসংবাদ, বেআব্রু ইজ্জৎ
দাবানল হয়ে, দাবানল হয়ে গোগ্রাস গিলতে লাগল
সুবিশাল অরণ্যভূমি।

মানুষ দেখেছি

মানুষের মুখের আদলে আমি মানুষ দেখেছি।
ভিড়ের শহরে, প্রায় নির্জন জনপদে, লংতরাই আঠারোমুড়ার
নিরন্ন-প্রায় পাহাড়ী মানুষের মুখে আমি মানুষ দেখেছি।
চায়ের দোকানের শিশু-শ্রমিকের মুখে, দিনমজুর বারিক মিঞার মুখে
ঠিকে-ঝি নিয়তির মুখে আমি মানুষ দেখেছি। মানুষ দেখেছি
জেল-হাজতের কয়েদির মুখে। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে
প্রতিবিম্বের মুখেও আমি মানুষ দেখেছি।

গল্প

নিটোল পাপের মতো দেখিনি তো কিছু
চোখেরা তবুও কেন আসে পিছু পিছু
এসেছো জোছনা দিয়ে ঘামে ভেজা রাতে
আমার বুকে ব্যথা—দু'হাত তফাতে
চোখেরা পেয়েছে স্বাদ, গল্প উপভোগ্য
তোমার কলঙ্ক থাক—আমার বৈরাগ্য।

ভারতবর্ষ

হরপ্পার ধ্বংসস্তূপের উপর
প্রাচীন ইতিহাসের উপর আকাশ-আবহে
তোমার বিশাল দেহ থেকে শতগুণ বিশাল দেহ
আঙুল তুলে শাসন করছে ভারতবর্ষ।
শাসন নাকি অপশাসন, নাকি অলৌকিক সুশাসন
অনুভবভেদ্য হবার আগেই
ঝুপ করে সন্ধ্যা নামল
আকাশ-আবহে

তোমার সদ্য-অদৃশ্য অবয়ব ভুলে গেল ঘুমন্ত পৃথিবী।

গাছ

তোমার পায়ে পড়ি গো, দোহাই,
তরুণ-প্রাণ আমাকে মেরোনা। যতদিন বেঁচে থাকব,
তোমাকে ফুল দেবো, ফল দেব অঢেল। রাগী সূর্যের
রক্তচক্ষু শাসন থেকে তোমাকে রক্ষা করব। দেব ছায়া। আর
পালিয়ে বেড়ানো বাতাসটাকে আটকে রেখে বলব
উত্তাপ-ধ্বস্ত মানুষের জন্য পাখা হও তুমি।
তোমার প্রয়োজনের কথা জানি গো জানি।
তুমি বাড়ি বানাবে। সবরকমের গাড়ি বানাবে। আমাকে
উনুনে ঠেলে দিয়ে
ভাত রাঁধবে, হরেকরকমের খাবার।
তাই বলে তরুণ সন্তানকে খুন করবে কেন?
বরং বুড়ো আমাকে খুন কর। আমি হাসিমুখ দধীচি হব।

রূপকের টেলিফোন

রূপক, টেলিফোনের ওপারে কে ঐ রহস্যময়ী তরুণী, যে তোমাকে
রূপক, যুবাপুরুষ, তোমাকে
প্রতিদিন ঠিক দুপুর বারোটায় টেলিফোনে নাম ধরে ডাকে।
রূপক, কে ঐ রহস্যময়ী? কে সে? কে?
অচেনা যদি, তোমাকে তার নামধাম বলেছে কখনো? শহর ধর্মনগর,
নাকি দূর-অদূরের অন্য কোনো শহর থেকে প্রতিদিন দুপুর বারোটায়
কার সুরেলা কণ্ঠ ডাকে—রূপক, রূপক তুমি আছ?
রূপক, টেলিফোনের ঐ প্রান্তে কে ঐ রহস্যময়ী, যাকে তুমি
দেখনি কখনো, দেখনি কালাছড়ার শীত-বিকেলের মেলাপ্রাঙ্গনের ভিড়ে;
সচেতন চোখে দেখনি কোনো বন্ধুর বাড়িতে। কে সে? কে?
রূপক, সে কি তোমার বিস্মৃত হয়ে থাকা কলেজ-জীবনের কোনো
বান্ধবী?
মনে পড়ে? পড়ে?
রূপক, টেলিফোনের ওপারের, অদৃশ্য আড়ালের রহস্যময়ী তরুণী কি
তোমার রজনীস্বপ্নের, নীললোহিতের উপন্যাসে পড়া কোনো রূপসী
মানবী?
যার মুখ তীব্র এই জাগরণে, প্রতিদিনের বারোটার মধ্য দুপুরে
ব্লটিং-পেপার আঁকা নারীমুখ কোনো?

আমাকে দেশান্তরী করোনা

দোহাই, তোমার পায়ে পড়ি গো। বেআব্রু করোনা এই দেহ।
কীই-বা আছে আমার?
খানিকটা আগুনে পোড়া ঘাস। একটা পানাপুকুর।
একচিলতে অনুর্বর ভূমিতে বেড়ে উঠতে উঠতে থমকে যাওয়া
ফুল না-ফোটা কুমড়ো গাছ।
গ্রামের বাড়িতে যা থাকেই—কয়েকটি গাঁদাফুলের মাথাভারী গাছ।
রক্তজবা। আকাশ দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ার
দে দোল দোল তক্তপোষ।
শুধু মূল্যবান কিছু স্মৃতি আছে। সেই স্মৃতিই না হয়
তোমাকে দেব।
দোহাই, তোমার পায়ে পড়ি গো। আমাকে দেশান্তরী করোনা।

নাম

চোখের সুমুখে এই যে নদী
ধীর লয়ে বয়ে চলা কলকল্লোলিনী নদী, কখনো বানভাসি জলে
দুঃখ ছড়ায়, কখনো শস্যভূমি উপহার দ্যায়—তার জলে, তার পাড়ে,
তার ঘূর্ণিস্রোতে কোনো নাম তার লেখাজোকা আছে?
সে তো কর্ণফুলিও হতে পারে, হতে পারে জিয়াভরলি, বিপাশা হলেও
আপত্তি নেই কোনো, হতে পারে মায়ানমারের ইরাবতী নদী।
নামে কী আসে যায়—নদী,
সে তো নদীই।
সুমুখে তোমার এই যে অরণ্যভূমির অত্যুচ্চ পর্বত—শীর্ষচূড়ায়
দুধসাদা অনন্ত তুষার, রডোডেনড্রনে সাজানো শরীর, অথবা
ঢেউ তুলে নেমে যাওয়া অথৈ সবুজ—সে কী হিমাদ্রি হিমালয়?
নাকি মধ্যপৃথিবীর অবাক কিলিমাঞ্জারো, অথবা সীমান্তিক ইউরাল?
তার উঁচু ও বিস্তৃত দেহের কোথাও কী খোদিত আছে
পরিচয়-জ্ঞাপক কোনো নাম?
নামে কী আসে যায়—পর্বত,
সে তো পর্বতই।
দ্যাখো, নির্নিমেষ চোখ, দ্যাখো,
দূরের রহস্যঘেরা দিশ্বলয়ে এক হয়ে যাওয়া সমুদ্রের অনন্ত সুনীল।
সে কী ভারত মহাসাগর? চিন সাগর? নাকি
দিশাহীন দূর অতলান্তিক?

কখনো সুবোধ বালক, কখনো দূরন্ত অস্থির যোদ্ধা।
সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের মনোরম চিত্রাঙ্কনে ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মনের
তুলি ও ইজেল।
চোখে পড়ে নাম কোনো তার? কোনো নাম তার লেখা আছে
গাঙ্চিলের ডানায়? গর্জনশীল চল্লিশার দুর্বিনীত হাওয়ায়?
পাহাড়-পাহাড় ঢেউয়ে?
নামে কী আসে যায়—সমুদ্র
সে তো সমুদ্রই।

দূরে, অদূরে কিংবা সুদূরে
এই যে গ্রাম-জনপদ, কৃষকের মাঠ, শালুকফুল ফোটা
থিরজলের পুকুর, নদীপাড়েব বাঁশঝাড়ে তিরতিরে মৌসুমী হাওয়া
সে তো ভাগ্যপুরও হতে পারে, ভিন্ দৃশ্যপটে ব্রাজিল অরণ্যের
কোনো গ্রাম, হতে পারে সুঘন উত্তাপে
দূর মরুশহরের নিঃশ্বাস ছোঁওয়া দূরত্বে অচেনা কোনো জনপদ।
নামে কী আসে যায়—জনপদ
সে তো জনপদই।

আমাদের সুমুখে
এই যে একটা মানুষ—তার গায়ের রঙ আগুনে পোড়া
ইটের মতো তামাটেও হতে পারে;
হতে পারে তেল-কুচকুচে কালো।
সে কোন্ ভাষায় কথা বলে? গান গায়? বিলাপ করে?
সে কী কগ্‌বরক? তেলেগু হলেও আপত্তি নেই। অথবা
মেরু-উত্তরের গৌণ কোনো আঞ্চলিক ভাষা। সুনির্দিষ্ট
কী নাম তার?
নামে কী আসে যায়—মানুষ,
সে তো মানুষই।

অভিমন্যু

তুমি আমার দাঁত ও মাড়ির সীমান্ত প্রদেশে আটকে থাকা
কাঁটা
তুমি আমার মোহিত স্বপ্নে চড়া ভলিয়্যুমের স্বপ্নভঙ্গ
ধ্বনি।
তুমি আমার গৃহসুখে, কাব্যচর্চা পাঠ্যাভ্যাসে কাজের মাসির
অনুপস্থিতি।
তুমি আমার দিনান্তের বিরল-প্রাপ্ত বিশ্রামসুখে বন্ধুজনের
আড্ডা।
তুমি আমার মধ্যরজনীর বইপত্র-সাময়িকীর শব্দবাক্যে
তেড়ে আসা ঘুম।
তুমি আমার ভবিতব্য—চক্রব্যূহ-মুক্ত দূর-অস্ত্—আমি,
অভিমন্যু আমি।

পিকনিক

যে পনেরোজন তরুণ হৈ-হুল্লোড় করতে করতে
মিনিবাসকে বোয়িং ভেবে অরণ্যভূমিতে
পিকনিকে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে মাত্র দু'জন
গভীররাত্রে অচৈতন্যপ্রায় যখন বাড়ী ফিরল, তাদেরকে
চট্‌জলদি সনাক্ত করা তাদের মা-বাবারও সাধ্য ছিল না।

পিকনিকে কদাক্কচিৎ যেসব দুর্ঘটনা ঘটে, এ ক্ষেত্রে তার
কিছুই ঘটেনি
বাস খাদে পড়ে যায়নি। খাদ্যে বিষক্রিয়াও ঘটেনি। বেহিসেবী
মদ্যপানও করেনি। তবু দুর্ঘটনা ঘটেই গেল।

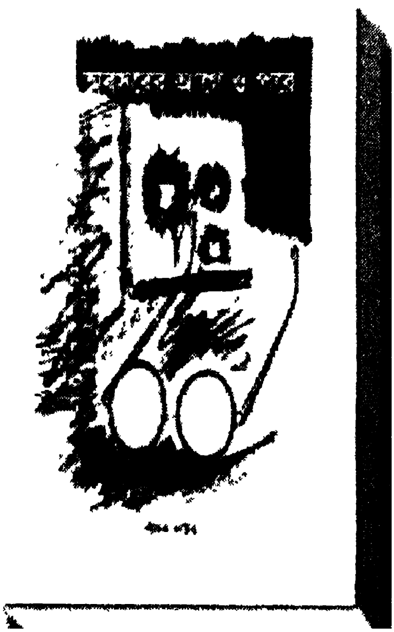
ওরা পনেরোজন যেখানে গিয়েছিল সেখানে বছর দশেক মানুষের কোনো
পদচিহ্ন পড়েনি।
ওরা ছিল দুর্বার দুঃসাহসী।
কবি নজরুল, তুমি যতই যৌবনের জয়গান কর না কেন, ওদের মধ্যে
তেরোজন কিন্তু
বাড়ি ফেরেনি। কবে ফিরবে, কিসের বিনিময়ে ফিরবে, আদপেই
ফিরবে কিনা, কেউ জানে না।
কে জানে, হয়তো বিনিময়মূল্য, তেরোজন পিতার গোটা জীবনের সঞ্চয়
নিয়ে
বৈরীদের ক্রোধ তেরোজন পিতাকে উপহার দেবে তেরোটি তরতাজা লাশ।

হে অগ্নি

হে অগ্নি
হে অশান্ত
হে ব্লাডপ্রেসার
হে রুশদি   এই জীবনকে   এই প্রাত্যহিককে
দু'দণ্ড সুস্থির বসতে দিও না।
চড়ুই হও
ঝরাপাতা হও
এয়ার ইণ্ডিয়ার বিমান হও।
অবশেষে
লেলিহান অগ্নি হয়ে
উত্তপ্ত কর
পোড়াও মরচে-ধরা পরিবেশ।
জোয়ার হও।
ডোবাও   ভাসিয়ে দাও   পাপ ও অন্যায়।

শেষ জাহাজের প্রতীক্ষা

সেদিন কিছুই থাকবে না। না পাহাড়। না সাগর। না আকাশ—
কিছুই না।
তৈজসগন্ধে বিমোহিত হবে না
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তোর। ছেঁড়া তোশক। উলঙ্গ বালিশ।
দেহাশ্রিত সুখ থেকে, দুঃখ থেকে বহুদূরে
শুধু শেষজাহাজের প্রতীক্ষা। শুধুই শেষ ভোঁ শব্দের উৎকর্ণ প্রতীক্ষা।
যাব কি যাব না—এ বিষয়ে দ্বন্দ্বাতীত সংকল্প। বাদাম ভেঙে
খোসা ছাড়ানোর অলস ক্রিয়া ও অভ্যাস ভুলে যাবে আঙুল।
ইন্দ্রিয়াতীত অনুভবে কখন যে দিবস, কখন যে রাত্রি
মনেই পড়বেনা।
সেদিন কিছুই থাকবেনা।
স্মৃতিপুঞ্জে হীরে-উজ্জ্বলতায় লাগবে পূর্ণগ্রাস গ্রহণ। তারপর
রক্তের উত্তরাধিকার বিষয়ে আর কোনো ভাবনা নয়। শঙ্কা নয়।
শুধুই বন্দর জেটিতে শেষ জাহাজের প্রতীক্ষা। প্রতীক্ষায় থাকবে
অনড়-প্রণয় এই নশ্বর দেহ।



অবসরের আগে ও পরে

স্রোত : হালাইমুড়া : কুমারঘাট : উত্তর ত্রিপুরা
প্রকাশকাল : ২০০৪

আশ্রয় কোথায়

গুলির শব্দে
আগুনে উত্তাপ
ক্রন্দনে সন্তাপে অধীর হৃদয় থেকে—
          পালিয়ে যাচ্ছে পাখি ও হরিণ। ওরা যাবে কোথায়?
আকাশ, আকাশ তো পাখিদের চূড়ান্ত আশ্রয় কখনো দেবেনা।
কাঁটাতারের সীমান্তিক বেড়া আটকে দেবে হরিণকে।

পরিবেশ দূষণ অনিবার্য জেনে
সপরিবারে বুড়ো-কৃষক যে রেলগাড়ীতে উঠলো, কে জানে
কোন্ অন্তর্ঘাতের খপ্পরে পড়ে
          সেই ট্রেন সংবাদপত্রের শিরোনাম হবে!

রূপকথা

রূপকথা,
রূপকথার রাজকন্যা
মায়াবিনী রূপকথা
ঝড়জলের এই বিকেলে
তোর্ষা নামের পাহাড়ী নদীর মত শহর শিলচরে
তোর আবির্ভাব
তোর প্রথম নাতিদীর্ঘ দৃষ্টিপাতে যখন
অনুভবহীন বিস্ময়, তখন মে-দিবসের
মেঘলা বিকেলে
সোনা-আলোর ছটায় ভরে গেল গোটা আকাশ।

এ এক অদ্ভুত কাণ্ড!
তিরিশে এপ্রিলের দুপুরে
ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রে মেঘ এমনভাবে
ডানা ছড়াল, মনে হল
এই মেঘ বুঝি অনন্তের মেঘ, কালান্তক মেঘ।
আজ মে-দিবসের শেষ বিকেলে
বৃষ্টি যতই অবাধ্য হোক, ডুবে যাক
শহর শিলচরের পথঘাট; সূর্য অবেলায় অস্ত যাক,
রূপকথা।
রূপকথার ছোট রাজকন্যা, রূপকথা
তোর আলোয়, রূপের আলোয় নিমেষমাত্রই কেটে গেল
মেঘ।

কুম্ভকর্ণ

বিকট একটা হাই তুলে লোকটা বলল—ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।
সেই সময়
ব্যূহ রচনা করে তার চতুর্দিক বেদখল করছে ঘাতক আগুন।
ধন্যি বাপু, বিপদ বলে বিপদ, সম্ভাব্য মৃত্যুকে অনুভব করেও
তুমি ঘুমোতে পার!
লোকটা সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্রী কিংবা প্রধানমন্ত্রী। নচেৎ আগুনকে
আগুন বলেই ভাবতে পারতো। মৃত্যুভয় খামচে ধরতো বুক।
তা তো হলই না।
লোকটা ঘুমোতেই থাকলো। ঘুমোতেই থাকলো।

মেঘ ও বাতাসকে

দূরাগত মেঘ এসে বলল—
গুমোট গরমে বাতাস এসে বলল—
তোমাকে দেখতে এলুম।
বিস্ময়-ঘোরে চমকে ওঠে চক্ষু। বলে—
কই, তোমাদের তো চিনতে পারলুম না

শেষ দুপুরের অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি—
একদিনের ক্যাজুয়েল লিভও তোমাকে দেবেনা।
বহু দিনের চেনা মুখ ভীষণ অচিন। ভালো করে
দেখব যে, তার সুযোগ কোথায়?

লক্ষ্মণের অভয় গণ্ডী মুছে গেছে বলে
দিবস ও রাত্রির মধ্যে ভেদাভেদ নেই। অতএব
মেঘ তুমি, বাতাস তুমি
অন্য কোনোদিন এসো।

এত রক্ত কেন

ধ্বস্ত-আহত লক্ষ তিরিশ চক্ষু থেকে উবে গেছে
নিথর রাত্রি। রাত্রির ঘুম। রাত্রির মোহিনী মায়া।

তুমি, তুমি কি সংবাদকর্মী?
হাতে তোমার খোলামুখ ডট্‌পেন কী লিখবে?
কোন্ সংবাদ?
ঘুম না-পাড়ানো টেলিভিশনের একুশ ইঞ্চি পর্দায়
তোমার চক্ষু কেন অন্ধ এতো?

বাইরে নিথর অন্ধকারে, জনমনুষ্যহীন পথে
ঝিঁঝিঁ পোকার আবহসঙ্গীতে, হাওয়াদের ভেসে
বেড়ানোর শব্দে

ভয়তাড়িত কুকুরের গোঙানিতে, হে সংবাদকর্মী
তুমি কি একটু বেশী রকম ত্রস্ত?
পাহাড় জ্বলছে। জ্বলছে লাখো তিরিশ মানুষের বিশ্বাস।
সমরেশ মজুমদার প্রশ্ন করেন, 'এত রক্ত কেন?'

তোকে—উপহার

তোকে কী দেব?
সাদা নক্সাকাটা রক্তিমাভা রুমাল? এক বাক্স জয় গোস্বামী? নাকি
একটিন পোড়া মোবিল?
এক পাটি ছেড়া চটি?
কী দেব?
চাইবো না তোর ভিখিরি হাত শূন্য থাকুক।
খুচরো পয়সার ভীষণ আকাল। পকেট হাতড়ে পকেট হাতড়ে
১০পয়সার মূল্যের একটিমাত্র মুদ্রা।
অতএব এটাই নে। নে।
মন খারাপ?
আমার গায়ের শার্টটা ভীষণ পুরোনো, ময়লা ও পোকায় কাটা।

নে, খুলে দিলাম। এটাই নে। নে।
তোর জন্য
আমার দয়ার অন্ত নেই। ঘৃণাও তথৈবচ।
আজ সোমবার। তোকে দয়া দেব, তো কাল মঙ্গলবার,
উপহার দেব একবুক ঘৃণা।

তুই আমার মিত্র না শত্তুর—গেল অর্ধশতকেও এটা বোঝা গেল না
মিত্র ভেবে তোকে দিতে পারি আমার যন্ত্রস্থ কাব্যগ্রন্থের
উৎসর্গ পৃষ্ঠা।

শত্রু ভেবে মদের গেলাসে একফোঁটা বিষ!

অন্য নায়ক

এখন শুরু হবে অন্য উপাখ্যান। উপাখ্যানের যে নায়ক
তার নাম?
ধরা যাক, তার কোনো নামই নেই। পদবী? না, তা-ও নেই।
উপাখ্যানের পটভূমি?
সে বোযালিপারও হতে পারে। অথবা কৃষ্ণটিলা।
সে' উপাখ্যানেব নায়ক, দেখতে কী রকম?
উত্তমকুমাবের মত? না কি পুরাতন ভৃত্য কেষ্টার মত?
এক রকম হলেই হল।
অদ্ভুত অপার্থিব এই চরিত্র কাঁদতে জানে না। হাসতেও।
জানেনা সব্যসাচীর মত দু'হাতে বন্দুক চালাতে। অথবা
জড়ভরতের মত জড় হয়ে থাকতে।
তার হৃদয়? তার গোপন অন্তর প্রদেশে আছে কয়লাখনির
অন্ধকার। সুখে-আহ্লাদে, দুঃখে-ক্রন্দনে তার
সংকোচন-প্রসারণ কিছুই ঘটেনা।
তাকে উপলক্ষ্য করে পাঠক-পাঠিকার উৎসাহ কৌতূহল
মার খেয়ে যায়। উপাখ্যানের এই নায়ক
শুধু চেয়ে থাকে, চেয়েই থাকে।

অবসরের আগে ও পরে

১. *পঁচিশে ফেব্রুয়ারি*

এক এক করে দীর্ঘ চল্লিশ বছরের শেষ তিনটি দিন। মাত্র বাহাত্তর ঘন্টা।
তারপর?
তারপর অন্যরকম দিনাতিপাত। অন্যরকম অভ্যাস। অন্যরকম দিশা।
তোকে কী দেবে? কী দেবে পীযূষ?
এমনতরো প্রশ্নোত্তর ভাববার মত মূর্খ বিলাসিতা
তোকে কিন্তু একদম মানায় না। একদম না।
বরং অবসরের নির্জন দুপুরে
বালক বয়সের ছোট ছোট স্মৃতি, হঠাৎ মনে পড়া বিশেষ কোনো
গন্ধ, যৌবনের শত শত বৈচিত্র্য ঘুরেফিরে আসুক।
আবারো আসুক। আবারো। আবারো।

২. *ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি*

ডা. নন্দী পুরকায়স্থ, অদ্ভুত এক শূন্যতার কথা আপনার
নৈশ টেলিফোন প্রাসঙ্গিকভাবে শোনালো।
আমার ব্যক্তিগত পূর্বানুমানের কথা, সম্ভাব্য অভিজ্ঞতার কথা
আপাতত মুলতুবি থাকুক।
বলেলেন—মার্চ-এপ্রিল কী বলে দেখুন, কী বলে
জুন-জুলাই।

৩. সাতাশে ফেব্রুয়ারি

এইবার সত্যি সত্যি ছিটকে পড়া
চেনা গ্রহ থেকে অচিন গ্রহে। অন্য কোথাও। অন্য কোনো
পার্থিব শূন্যতায় কিংবা পূর্ণতায়।
সুস্থির অবসরে অন্যরকম বসবাস
প্রায় ঠিক হয়ে গেল।
এ এক আনন্দ-বার্তা। নবজন্ম আমার
শোনো, তোমরা যারা দূরে আছো। আছো সুদূরে। কাছে আছো
চেনাজানা, আত্মজন যারা আছো,
শোনো, অবসর আমাকে ডাকছে। ডাকছে পদ্য
সঙ্গীত, চলচ্চিত্র। ডাকছে রেল ইস্টিশন ও ক্রিকেট

কাল,
আঠাশে ফেব্রুয়ারি মৃত্যুদিন নয়। জন্মদিন। জন্মদিন আমাব

৪. আঠাশে ফেব্রুয়ারি

নির্ভার তুলোর মতো, মেঘেদের মতো
উড়ে যাচ্ছে আঠাশের ভাবনা। মধ্যরাত্রির একক ভাবনা।
ভাবনার ঘরে বিকেল চারটে কুড়ির পর
আজ আর কেজো পৃথিবীব ভিড় নেই কোনো
যাদের সঙ্গে অনেক অনেক সৌরদিবসের দুপুব, তাদের মুখে
বিকেল চারটে কুড়ি অবধি ভালবাসার ছোট ছোট কথা।
কিন্তু
শেষ ফেব্রুয়ারির শীত যথেষ্ট সহনশীল। বসন্ত তবে কাছেই
শেষ দশকের শেষ কয়েকটি বছর ব্যস্ত ছিলে খুব। ছিল
সকাল দশটার অভ্যস্ত টেনশান। ছিল অনাবশ্যক ক্রোধ।
তারও আগে
সাত বছর আগে টানা বহু বছর পড়ুয়াদের সঙ্গে ভীষণ, ভীষণ বকমে
বন্ধু হয়ে, সহমর্মী হয়ে
প্রত্যেকটি দিন ছিল সুখবহ শরতের দিন।
অবশেষে এলো। আঠাশে ফেব্রুয়ারি।
অবশেষে এলো।
এবং চলেও গেল
অতঃপর অন্ত প্রবাহের নদী, বেলাশেষের নির্জনের নদী।

পাঁচই মার্চ

শক্তি চাটুজ্যের ভাষায়
যাব।
কিন্তু দীর্ঘ টানা বারান্দাব প্রার্থনা-সভায় দাঁড়িযে বলব না—ছেলেরা
সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াও।
যাব।
কিন্তু ফাইন্যাল বেল পড়ার পর আমার জুতোব শব্দ বারান্দাব
এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি নীরবতাকে চমকে দেবে না আর।
যাব।
কিন্তু খালি-চেয়ার ক্লাসরুমে ঢুকে বলব না—যাও
স্যারকে ডেকে নিযে এস।
যাব।
কিন্তু সাড়ে চার বছরের চেনা চেয়ারে বসে আমার আঙুল
কলিংবেল টিপে ডাকবে না সুনীল কিংবা সুশীলকে,
নিরঞ্জন কিংবা আরতিকে।
যাব।
কিন্তু আপিস কিংবা টিচার্স কমনরুম, অথবা গরীব ক্যান্টিন
যেখানে খুশি
যে কোনোদিন কাজের দুপুরে চেয়ার বা হেলানবেঞ্চে বসে পড়ে
কিছুক্ষণ তোড়ে আড্ডা দেব।



মন্ত্রপূত রুমাল

জিগীষা : কলকাতা
প্রকাশকাল : ২০০৫

অভিযান

অসহ্য বর্ষার পর
অদ্য চমৎকার সূর্য।
বন-জঙ্গল এবং নদী-উপত্যকা পার হয়ে
                                        পার হয়ে
কাঁধে পর্যটকের ঝোলা, মনে রাণাপ্রতাপের ঘোড়া
উপস্থিত হলুম সাত কিলোমিটার দীর্ঘ এক
                                        সুড়ঙ্গের মুখে।
অন্ধকার, খুনে অন্ধকার
ধূর্ত চিতার মত মুখিয়ে আছে।
কাপুরুষের মত পালিয়ে যাব? না, কক্ষণো নয়।
অসহ্য বর্ষার পর
অদ্য চমৎকার সূর্য।
সঙ্গে টর্চ নেই তো কী হল! আছে বেড়ালের মত
আঁধারভেদী দৃষ্টি। একটুও টালমাটাল না হয়ে
শ্যাওলায়, উপলখণ্ডে একবারের জন্যও হোঁচট না খেয়ে
সাত কিলোমিটার দীর্ঘ সুড়ঙ্গ
                                        অনায়াস অক্লেশ
                                        এই মুহূর্তে পার হয়ে যাব।
কী আছে ঐ প্রান্তে?
সুরম্য তোরণ? ঐ প্রান্তে শস্যশ্যামল উপত্যকা আছে?
বসতির জন্য অত্যুর্বর ভূমি?
দৃষ্টিনন্দন পাহাড় আছে? সমুদ্র? আছে নারী?
হাস্যোজ্জ্বল সুখী প্রতিবেশী?
সাত কিলোমিটার সুড়ঙ্গপথে
ভয়াল রহস্যময়তা, পিচ্ছিলতা এবং উন্মুখ ক্ষুধার্ত সরীসৃপ
                                        এখন আর তিলার্ধ বিবেচ্য নয়।
ঠিক দ্যাখো,
এইভাবে অনিবার্য অকুতোভয় অবলীলায় পার হয়ে যাব
                                        সাত কিলোমিটার রহস্যরঞ্জিত সুড়ঙ্গের পথ।

আবারো আসুক

অশ্বারূঢ় চেঙ্গিজ খান—সেই এক দুর্দান্ত টাইফুন
পথে ও প্রান্তরে, গ্রাম-জনপদে
ধূলিঝড় তুলে আবারো আসুক। হ্রেষারবে সোল্লাস,
চমকে উঠুক বনস্থলি, ঘুমকাতুরে মানব।

আলেয়া

সেই থেকে
গ্রামীণ অন্ধকারে ডিভোর্সি জ্যোৎস্নার বিষণ্ণতায়
আলেয়া উত্তরের কালাছড়ার পাড় থেকে দক্ষিণের
ধানমাঠের প্রান্তে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই উধাও।
ফের হাজির। আলেয়া এক চলমান আলোক-বিন্দু নীরব সম্বোধনে
ডাকছে, ডেকে ফিরছে টানা সাঁইত্রিশ বছর।

আলেয়া, তোর জন্য আমার পাগল তৃষ্ণা অসহ্য বড়।
তৃষ্ণা তুই, আত্মঘাতী মরণে স্বেচ্ছাব্রতী হ অথবা পাখি হয়ে
যা পাখি যা, দেশান্তরে যা, আকাশ সীমান্তে তো পাখাওয়ালা
সেনাটেনা নেই। যা তুই নির্বিবাদ যা।

উন্মাদ নাকি অজাগতিক দুঃখ, তুই আমার প্রথম প্রেমিকা
সমুদ্র-কলোচ্ছ্বাসে আলেয়া হয়ে আলেয়ার মতো অলৌকিক
আলোকবিন্দু, তৃষ্ণার বুকজ্বলা আগুন টানা সাঁইত্রিশ বছর এখনো,
এখনো আছিস।

রাজা হয়ে উঠি, কখনো সম্রাট

জটিলতার প্রতিটি গ্রন্থি অক্লেশ খুলে যায়।
সহজ লাবণ্যে উন্মোচিত হয়
বারবার বহুবার দেখা পারিপার্শ্বিক।
উন্মোচিত হয় দৈবলব্ধ মনসার ঝাঁপি।
দিনাবসানে
এই রাত্রি বড় সুখী রাত্রি। আঁখিপল্লবে
স্নিগ্ধ কজ্জল। স্বপ্নে-স্বপ্নে
মানসের অভয়ারণ্যে চিত্রল হরিণ।
বিচিত্র অনুভবে হেঁটে বেড়াই
এ বাড়ি ও বাড়ি, পরস্পরের বিনিময় করি কুশল-সংবাদ।
শহর রঙবদল করে।
রাম ও রাবণ আলিঙ্গনাবদ্ধ অদ্ভুত সুখে
আচানক অভিন্ন হৃদয়।
এভাবেই সহসা
জটিলতার প্রতিটি গ্রন্থি অক্লেশে খুলে যায়।
খুলে যায় দক্ষিণের স্বাস্থ্যকর দরোজা-জানালা,
আমি রাজা হয়ে উঠি, কখনো সম্রাট।

ত্রিপুরা ১৯৯৪

শেষ ঘাতকের মারুতিভ্যান বধ্যভূমিতে পৌঁছানোর আগেই
কবিৎকর্মা পুরুষ
প্রতিদিনের অভ্যাসমত জগিং সেরে তোয়ালে ঘষে ঘাম
মুছলেন। তারপর দুধহীন চায়ের আস্বাদ নিতে নিতে
দেশ-বিদেশের খবর পড়লেন।

পটভূমি তখনো
ভীষণ ভীষণ নির্জন, তখনো অর্ধবৃত্তাকার আকাশ
নির্মেঘ ব্লু।
এই ভেবে কখনো তার নিশ্চিন্তি
গাঢ় ও গভীর ঘুমে নিদ্রিত, পারিপার্শ্বিক জনপদে
শত্রুজিৎ তিনি।
তখনো ভালবাসার ভিৎ মদ্যপ যুবার মত
ভুল পথে পড়ে থাকার অশ্লীলতায়
টাল খায়নি।

দেশকাল কত দ্রুত পাল্টে গেছে—এই ভাবনা যখনই
বুদ্‌বুদ্ তুলবে, তখনই
প্রহরা ভেঙে শেষ ঘাতকের মারুতিভ্যান মুহুর্মুহু
আঘাত হানবে।

করিৎকর্মা পুরুষের ভিন্ন পৃথিবী তখন অদ্ভুত নির্জন।

ফেরাও স্যন্দন

সেই বল্গাহীন দৌড়
রীতি বহির্ভূত ম্যারাথন দৌড়, দুরন্ত চৈতকেব ধাবমান
পদশব্দে শেষ চৈত্রের ঝড়, কনকর্ড বিমানের
আকাশ চমকানো শব্দ, গর্জন চল্লিশার অসম্ভব তাণ্ডব
শব্দসুষমার প্রয়োগ থেকে এইবার অবসর কেন?
বয়সের ভারে ন্যুব্জ? নাকি স্বপ্ন-প্রয়াণের বিষণ্ণতা
তোমাকে পৌঁছে দিল অন্তিম পৃষ্ঠায়?
পতনের সীমান্ত থেকে ফেরাও স্যন্দন। উঠে দাঁড়াও
টান টান।
ঝড়ো শব্দের অনুষঙ্গে, বল্গাহীন দৌড়ের অনুষঙ্গে
তোমাকে খোঁজে একবিংশ শতকের তৃষিত চোখ।

প্রার্থনা

আমাকে বাজহংসীব গ্রীবা দাও। ভিড়ে
নজব কাড়ব। বং সাদা চাই না।
সবুজ কবে দাও। নজব কাড়ব।
জিবাফেব গলাও দিতে পাব। ব্যালকনিতে দাঁড়িযে থাকা প্রতিবেশীদেব
সঙ্গে
সিঁড়ি না ভেঙে গল্পগুজব কবব। দিতে পাব জেব্রাব মত
ডোবাকাটা সাদাকালো শার্ট। নজব কাড়ব সহজেই
আমাকে ঐবাবতেব দেহ দাও। কোনো শত্রুই গা ঘেঁষতে সাহস পাবে না।
চোখেব মণিতে বসিযে দাও, ঈগলেব মণি। গোপন থাকবেনা কিছুই।
স্মৃতিকে কম্পিউটাব নিযন্ত্রণে দুর্বাব কব।
ভার্সিটিব নজব কাড়ব অবলীলায।

আগরতলা ৮০

যা সচরাচর আপনার চোখে পড়ার কথা নয়
যা আপনার ধাবাবাহিক ভাবনায কম্পন তোলার কথা নয়—এমন
অদ্ভুত নৈঃশব্দে
রাত্রি আটটাব আগবতলা, বাজধানী আগবতলা যেন শেষ প্রহবের মৃত্যুঘুমে
অলৌকিক প্রায।
চতুর্দিকেব অবণ্য যেন মাবণাস্ত্র হাতে অনন্ত অন্ধকারে তাকে
নজরবন্দী কবে রেখেছে :
এই অদ্ভুত প্রবাহে ভয়ডব-বিলাপ-ক্রন্দন আদপেই নয়। অথচ বুক ভেদ কবে
উঠে আসা
মহাশূন্যেব বিপ্ বিপ্ ধ্বনি অনেকেই শুনতে পায—যারা ঘুমে আছে
তারাও, যাবা বিনিদ্র বাত্রিব কষ্টে আছে, তারাও।
ছাই, বুঝিনা কিছুই।
ধন্দে পড়ি, মহাজাগতির নাকি স্থানিক ষড়যন্ত্রে
অসময় বিজ্ঞাপিত রাত্রি আটটার আগরতলায় ঘুম এল নিশুতি রাত্রির!

আশ্রম চৌমুহনি থেকে অরুন্ধতীনগর, টাউন প্রতাপগড় থেকে
শ্যামলীবাজার সর্বত্র
নির্জনতা ছবি হযে ওঠে। লোকে বলে মাইনাস কুড়ি ডিগ্রি সেলসিয়াস
সুনিশ্চিত হিমে
আজ কিংবা কাল
মানচিত্রে অবস্থান বদলে আগরতলা, রাজধানী আগরতলা
উত্তর সাইবেরিয়ায় পরবাসী হবে।

অনিলবাবুকে অনুরোধ

কবি সুবোধ সরকারের প্রতিধ্বনি হয়ে অনুরোধ করব—
অনিলবাবু, নিদেনপক্ষে প্রাইমারি স্কুলের একটা চাকরি দিন
রূপককে।
শহর আগরতলা না হোক, না হোক মহকুমা শহর ধর্মনগর,
তৈদুতে হলেও চলবে।
তন্মুহূর্তে অনুরোধ ব্যর্থ হল না।

অনিলবাবু ফ্যাক্স পাঠালেন দিল্লিতে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে
জানানো হল—মাথা খারাপ? চাকরি?
চাকরি কি সুপুরি গাছের সুপুরি?
অনিলবাবু পত্রপাঠ রূপককে দুঃসংবাদটা দিলেন। বললেন—
বি.এ-টা তো করেছ। এই ফাঁকে এম.এ-টাও করে নাও।
টো-টো করে ঘুরলে লাভের লাভ কিছুই হবে না।
হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো রূপকের মনে হল ভার্সিটি তো
নতুন সাবজেক্ট ইনপোরেট করেছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান নাকি
জ্যোতিষ-শাস্ত্র!
ফার্স্ট ব্যাচ তো!
কিছুই বলা যায় না। পাশ করলে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী
তার দাবিকে হয়তো নস্যাৎ করবেন না।
চাই কি খোদ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়েই অধ্যাপকের একটা
সুভদ্র চাকরি হয়ে যেতে পারে।
উপরন্তু অনার্সে তো তার দেবভাষা ছিলই।

অসিত-চন্দ্রিমাকে

'ফুল ফুটুক না ফুটুক'।
দ্বিধা কেন এতো? ফুল তো ফুটবেই!
চতুর্দিকে এতো এতো আলো। এতো এতো ভালোবাসা।
ফুল তবে ফুটবেনা কেন?
হলই বা কংক্রিট শহর গিলে খেয়েছে মাটি। গিলে খেয়েছে
মানুষের অবসর। গিলে খেয়েছে রূপতৃষ্ণা ব্যস্ত মানুষের।

তবু কিছু কিছু মানুষ, কবি অথবা মনে মনে কবি, অসিত,
তোমার মতো দুর্লভ কিছু মানুষ, চন্দ্রিমার মতো প্রেরণা,
মাটি খুঁজতে খুঁজতে শহর থেকে দূরে
মাটির সংসারে অফুরান আলো আর বৃষ্টির দেশে
ফোটায় ফুল, ফুল আর ফুল।

স্বেচ্ছানির্বাসনে কবি অনন্ত মিত্তির

মফঃস্বল শহরেব কবি সম্মেলন থেকে
শীতবাত্রিব মধ্যযামে বাড়ি ফিরে কবি অনন্ত মিত্তির মনে মনে
সাব্যস্ত করলেন—ঢের হয়েছে। আর কাব্যচর্চা নয়।

একান্নজন যশোপ্রার্থী পদ্যকারের একাত্তরটি পদ্যের মধ্যে
অনন্ত মিত্তির পদ্য খুঁজতে ব্যর্থ—আশাহত হয়ে
সুনিশ্চিত হলেন পদ্যপাঠক কিংবা শ্রোতা হিসেবে
তিনি নিজেই ফেল করা ছাত্র।

একাত্তরটি পদ্যের কয়েকটি শীর্ষনাম 'স্বাধীনতা', 'ভারতমাতা',
'বোফোর্স', 'কারগিল', 'স্বদেশ' ও 'বিচ্ছিন্নতাবাদ' কবি অনন্ত মিত্তিরকে
নিঃসঙ্গ করে তুললো। তিনি ভাবতে বাধ্য হলেন, তিনি এক
সমাজভ্রষ্ট একলা মানব।

অনন্ত মিত্তির পেশায় স্কুলশিক্ষক। সাব্যস্ত করলেন কাল থেকে
আর পদ্য নয়, 'স্বাধীনতা', 'কারগিল' কিংবা 'বিচ্ছিন্নতাবাদ' বিষয়ে
ইস্কুলপাঠ্য প্রবন্ধ রচনায় মনোনিবেশ করবেন।

হত্যা

অলক। অলক নাকি পুলক। তারস্বরে ডাকছে তোমাকে। তারস্বর।
সামনে ভিড়। শব্দদূষণ। সার্কাস। গান্ধীমেলা। সূর্যাস্তের বেলা।
বাড়ছে ভিড়। বাড়ছে ধূলি ঝড়। কল্লোল-কোলাহল। হরবোলা।
কোরাস।

অলক। অলক নাকি পুলক। নাকি অন্য কেউ। ডাকছে। ডাকছে তো ডাকছেই।
ওরা কারা? অলক নয়তো? পুলক? নাকি অন্য কেউ?
লক্ষ্য কর। লাল শার্ট। ব্ল্যাক জিনস্। ময়ূর রঙ সানগ্লাস।
হাতে আগ্নেয়াস্ত্র।

দুর্ঘটনা। নাকি হত্যা। থানা-পুলিশ। ভিড়ে ভিড়ে ছয়লাপ। পথ।
পিচের রঙ লাল। রক্তনদী। পড়ে আছে লাশ। কার লাশ? কার?
চেনা মুশকিল। হয়তো। হয়তো তেমার। হ্যাঁ। হয়তো তোমার
নিজেরই।

ঠিকানা বদল

তোর এক পা যখন ধর্মনগরে
তখন আরেক পা অদূর শিলচরে—এই রকম অলৌকিক অস্থির অভ্যাসে
তুই তো জল হয়, হয়তো কাপে
নয়তো গেলাসে।

প্রশ্ন তবু উঠবেই।
পৃথক পিনকোড্
পৃথক টেলিফোন নম্বর অবশেষে কী দেবে তোকে? না দু'দণ্ডের সুখ,
না শান্তি, না আর্থিক স্বচ্ছলতা—কিছুই দেবেনা।

এই হেতু অনেকেই বলে, ঘরের যারা, বাহিরের যারা চেনা-জানা
অনেকেই বলে—মূর্খ, পাগল, অসুস্থ। বিশেষণের পর বিশেষণ,
বিশেষণের পর বিশেষণ যোগ হয়ে যোগ হয়ে
দেশে-দেশান্তরে কেচ্ছা ছড়ায়।

এ যেন এক অদ্ভুতুড়ে মানুষের অদ্ভুতুড়ে কাণ্ড।
এই প্রজন্মের মানুষ তো এরকম ভাবতেই পারে, বলতেই পারে। ওরা তো
চর্মচক্ষুতে দেখেইনি দেশবিভাজনের ঠিকানা-বদল।

এই অভ্যাস, অতএব বুড়ো রক্তে ঢেউ তোলে আজো, এখনো।
কাল এমন ঘটনা ঘটতেও পারে।
তার এক পা কলকাতায় তো অন্য পা দূরস্থিত গোয়ায়।

সমুদ্র দেখব

সমুদ্রে যাব। জলে নামব না। নুলিয়া দেখব। কথা বলব না।
হোটেলে থাকব। ঘুমোব না। ব্যালকনিতে বসে থাকব। সারা রাত।
সমুদ্র দেখব। গর্জন শুনব। ঘুমোব না। বধিরও হব না।
ভোর হবে। সূর্যোদয় দেখব। কম্পমান নোনা জল। জলে দেখব
স্বর্ণবিচ্ছুরণ। পাল-তোলা নৌকো। নিদ্রাকাতর চোখ। তবু ঘুমুতে যাব না।

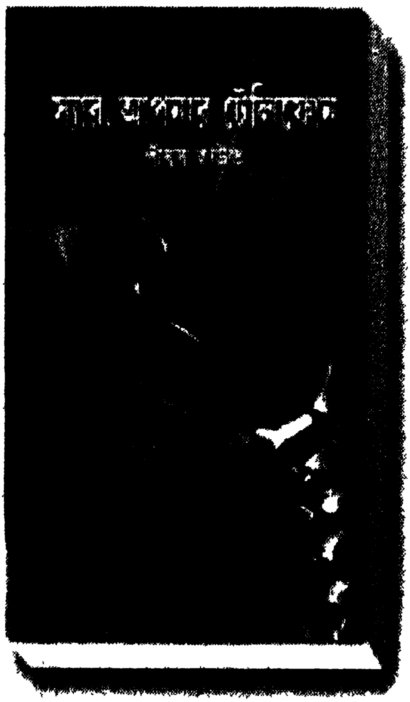
ধর্মে বিশ্বাস নেই। তবু মন্দিরে যাব। পাণ্ডাদের অত্যাচার সইব।
তবুও যাব। অন্ধ মানুষের ভিড়ে অন্ধ হব না। তবুও যাব। তবুও।
চিল্কা যাব। বোটে করে ডলফিন যাব। ডলফিন দেখব না।
ঘন্টাখানেক জলে ঘুরব। চিল্কার তীর-ছোঁয়া নীচ সমতল। পুকুর।
শত শত পুকুর। দেখতে-দেখতে হোটেলে ফিরব। তবু ঘুমোব না।
সমুদ্র দেখব। পুরীর সমুদ্র। সমুদ্রের বালিকা ঢেউ। আজ রাতেও
ঘুমোব না। জলে জ্যোৎস্না দেখব। জ্যোৎস্নার মরণ।

কাব্যকর্ম ? ফুঃ

ছাইভস্ম লেখার আগে
তুমি বরং নির্বাচন করো কী তোমার লেখা উচিত, এবং বলা বাহুল্য
কী তোমার অনুচিত।
সে বরং ভালো স্কুল-টিচারের নোটস্, ইনকাম-ট্যাক্সের খাতা।
এইসব লেখালেখির স্বপক্ষে জোরালো যুক্তি আছে। কিন্তু
কাব্যকর্ম ? ফুঃ
কে ধৈর্য্য ধরে পড়বে বলো ! সতীর্থ যারা, তারাও যে পাঠক নয়
করনি খেয়াল ?

ভাসানে যাব

তোমাকে নিয়ে
তাহাকে নিয়ে
নিজেকে নিয়ে অনন্ত ভাসানে যাব। গোপালপুরের পর্যটন-নিবাসে
সদ্য সদ্য ইতিহাস হবে। সমুদ্রের দুধসাদা ফেনপুঞ্জে
মৃত্যুকে দোসর ভেবে
সাঁতার কাটব অথবা ডুবডুব জলকেলিতে মেতে থাকব
                    সূর্যাস্ত অবধি।
শীতকুয়াশার মতো রহস্যে নিষিদ্ধ গোপন
                    গোপনেই থাকবে—কথা দিতে পারি।
কেউ দেখবে না
কেউ শুনবে না। কেউ না।
তোমাকে নিয়ে
তাহাকে নিয়ে সৃষ্টিছাড়া ভ্রমণে যাব। অথবা অনন্ত ভাসানে,
                    মনে মনে সহসা একদিন।



স্যার, আপনার টেলিফোন

ত্রিপুরা দর্পণ : কর্ণেল চৌমুহনী : আগরতলা
প্রকাশকাল : ২০০৬

জনৈক কবি সম্পর্কে

দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছরের দুঃখ ও উপেক্ষাব আগুন যেইনা নিবু নিবু হল, কবি
ভাবল,
এইবার সিং-দরজায় সুখ ও সম্মান কোজাগরী পূর্ণিমাব জ্যোৎস্না হয়ে
তাকে দেবে . । তক্ষুণি
মুহুর্মুহু দমকলের ঘন্টা বেজে উঠল, শকুনেব অশুভ চিৎকারে বেজে উঠল
ভয়ংকর সাইরেন। আসলে একদিনের জন্যও কবি ভাবেনি তার দেহের
অভ্যন্তরে
ভীমরুলের শৌখিন বাড়ি সমাপ্তপ্রায়।
তা হলে মরণোত্তর সম্মান দিও কবিকে।
কয়েক হাজার অপ্রকাশিত গদ্য-পদ্যে কবির গোপন আশা ও হতাশা
উপমা-উৎপ্রেক্ষা ব্যতিরেক
শুধু ম্লান উপচ্ছায়া ঘিরে কবির ভুল বসবাসে আছে, স্থিত হয়ে আছে
অপার শূন্যতার সহচর হয়ে।

ব্যক্তিগত মেধার ভিতর যদি নকলনবিশ ছাত্রের ফাঁকি, কবি তবে
কস্মিনকালেও
কবি নয়, পার্থিব ভূমিকায়, অন্য পিঠে সার্থক পুরুষও নয়। তা হলে
আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপিত কবির শবদেহে
কেউ কি উপহার দেবে একবিন্দু শিশিরের জল?

সত্যজিতের অনুষঙ্গে

সাঁইত্রিশ বছর আগে
সত্যজিৎ রায়কে এক হাত দূর থেকে সবিস্ময় দেখে
আমি আমার উচ্চতা, আমার ইতিবাচক অবস্থান আর সর্বোপরি
অহংকার সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে
দৌড়তে দৌড়তে একটা ইঁদুরের গর্তে ঢুকে পড়ে বিশ্রামরত
ইঁদুরকে বললাম—স্যার, আপনার উচ্চতা কত?
প্রত্যুত্তরে বলল—অবিকল আপনার সমান।

চিত্রকর

গ্রাম
কোথাও যেন অদৃশ্য ঘুঘু   শব্দ ক্রমে ছবি হয়।

পার্বত্য শহর
কোথাও যেন জলপ্রপাত   শব্দ তৈবি করে ছবি।

একটা গ্রাম। একটা নদী। একটা গাছ। একটা ঝোপ।
একটা ফড়িং। একটা প্রজাপতি।   এইসব নিয়ে ছবি।
ছবির পর ছবি।

শব্দ ছবি হয় নির্জনে
বনে এবং উপবনে   বিমনা বসন্ত উঁকি দ্যায়।
বলে—এই তো আমি। চিত্রকর আমি।

হব না কিছুই

এই এক দুর্বিনীত হাওয়া
এই এক পাগলকরা ঝড়
ছিন্ন করেছে বুক থেকে শিশু, সংসাব থেকে গৃহস্থ পুরুষ।
অশিক্ষিত অভ্যাসে ঝড়জলে, ভূকম্পনে
নুয়ে পড়ে গাছ। কুড়ুলের ঘায়ে দেহ থেকে রস।
আহ্লাদে আহ্লাদে শব্দ
সেও বড় বদ হয়ে গেছে। তৈরি করে না
তিলোত্তমা; অন্য অন্য কোনও দেহাতীত দেহ। তৈরি করে না
স্বপ্নের বাড়ি।
তো দুঃখী হব? সংসার বিবাগী?

কিছুই হব না।
তবু এই দুর্বিনীত হাওয়া
এই এক পাগলকরা ঝড়
যার জন্য না হলুম গৃহী, না হব কোনও দিন
শব্দের হাত ধরে কবি।

বৃত্ত ও বৃত্তবহির্ভূত

একটা বৃত্ত। অদৃশ্য অথচ অমোঘ।
বৃত্তরেখার বাইরে বিমুক্ত জীবনের উদ্ভাস। সূর্য ও চন্দ্রের
এ এক যুগলবন্দি খেলা।
এই উদ্ভাস, এই খেলা যাপিত জীবনে তাহাকে টানেনা বলেই
মৃত মানবের মত তার জীবনে আনন্দ নেই; দুঃখানুভূতি নেই।
বৃত্ত-অভ্যন্তরে ব্যক্তিগত ভুলে মাশুল গুনতে গুনতে গণনার অতীত
বিমূঢ় সে শুয়ে থাকে, শুয়েই থাকে।
বৃত্তরেখার বাইরে কালো ক্যানভাসে লাল অক্ষরে লেখা আছে—
প্রবেশ নিষেধ।
এখানে বৃত্ত-অভ্যন্তরে পচাগলা লাশ ঘিরে গা-ঘিনঘিনে
মাছিদের ভিড়। দুর্গন্ধ-বাহিত কুবাতাসে প্রতিদিন সাক্ষাৎ নরক।
তবু তাকে বাইরের সূর্য, বাইরের চাঁদ নিরন্তর ডাকে। ডাকে
দূরের পাহাড়। নদী ও সমুদ্র।
'যেন জন্মবধির। শুনেও শোনে না। দেখেও দেখে না।
অন্তর্চক্ষুও কদাচ দেখে না বৃত্ত-বহির্ভূত পৃথিবীর রূপ, অপরূপ রূপ।

ছুটি

এ কোন্ প্রজন্মের আলোচিত্র
বিশাল প্রেক্ষাগৃহের বিশাল সেভেনটি এম এম পর্দায়
সাপ, গিরগিটি, ক্ষুদে ডাইনোসর আর বন্দুকবাজ
বালকের সন্ত্রাস?
ইহজীবন থেকে ছুটি নিচ্ছি না কি
পালিয়ে বেড়াচ্ছি কে জানে।
এইসব নিয়ে যারা প্রতি-আলোচক, বিশুদ্ধবাদী
তারা তো যাদুঘরের মমি। এইসময়
তাদেরকে হাইলাইট করা কেন?
আপনি যদি সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক
আপনার ডটপেনে কালি আছে তো? আছে
টাটকা বিফিল?
পৃথিবী বদলাক কিংবা থিতু থাকুক, কী আসে যায়
মধ্যবিত্ত আপনার?
স্বপ্ননেশার ঘোর দুচোখে লাগবেই। পালাবদলের
দমকা হাওয়ায় ওলটপালোট ঘটবেই।
আপনি অস্বীকার করবেন? করতেই পারেন।
কিচ্ছু যায় আসে না ইহজীবনের। শাসক থেকে
তৃণমূল প্রজা, মধ্যবিত্ত তো বটেই,
সকলেই যেন
ইহজীবন থেকে ছুটি নিচ্ছি, পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

পলিটিক্যাল আইডেনটিটি

ছোটো এই শহবেব অতি পরিচিত অর্ধোন্মাদ বোবা যুবকটির
শবদেহকে লালশালুতে মুড়ে.যে মৌনমিছিল
শহর পরিক্রমা করল, তা বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষে
কতটুকু অনুকূল প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিল, তা কে জানে!

কে জানে আসন্ন ভোটযুদ্ধে লাভ-লোকসানের পাল্লা
অবশেযে কোন্‌দিকে, ডানে না বামে ঝুঁকবে
কে জানে!

অর্ধোন্মাদ যে বোবা যুবকটি দুই রাজনৈতিক দলের নির্বাচন-পূর্ব
খণ্ডযুদ্ধের মধ্যে পড়ে গিয়ে বোকার মতোই মরল, সে
নিজেই হয়তো জানত না তার পলিটিক্যাল-আইডেনটিটির কথা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

গেল কোথায় সেই বড়মাপের মানুষটা?
কোথায় গেল?
যে শুধু কথার জন্য, কথার মত কবিতার জন্য
সুদিনের দিনেও নেয়নি কোনও
সহজলভ্য জীবিকা-সুযোগ।
অনুপাত দেখলে কোটি-কোটি সর্বহারা, বন্ধুজন যারা,
তাদের মতনই
দুঃখকে বুকে চেপে, দুঃখকে আত্মীয় ভেবে শুধু
কথার জন্য, কথার মত কবিতার জন্য
চুরাশি বছর, দীর্ঘ চুরাশি বছর!

বেলা পড়ে এলে
কেউ কখনও বলেনি—কেমন চলছে আপনার
তিন পালিতা কন্যার সংসার?
কেউ জানতে চায়নি কীভাবে চলছে কবির সংসার।
মানুষটার বুকে কোনও অভিমান ছিল কি—ছিল না,
কেউ জানে না। তবু
চলে যাবার পর অনেক অজানা কথা, যে কথা
শুধু কবিতার জন্য নয়,
দুঃখ দ্যায় বড়।

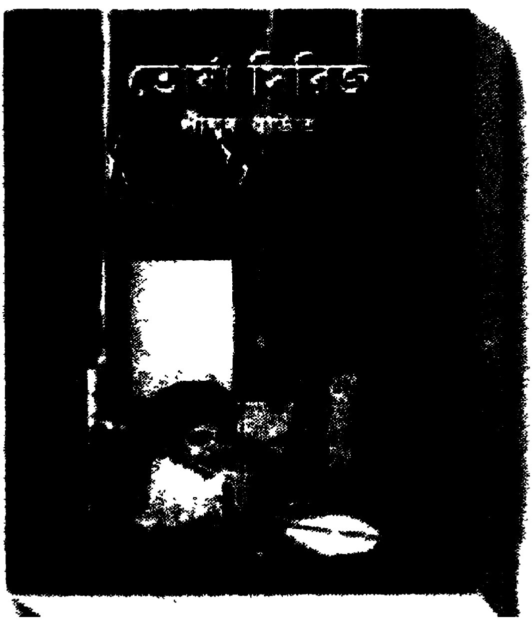
কে সে?

যে মেয়েটির সঙ্গে টেলিফোনে
দশ মিনিটের নিচুস্বর কথোপকথন,
কে সে?
সে কি হলুদ বাড়ির নীলাঞ্জনা?
কে নীলাঞ্জনা?
যে তোমার রূপকথা, উত্তরের দূরান্তিক বনে
হারিয়ে যাওয়া সুবাতাস?
রজনীগন্ধার ঘ্রাণে
সে কি ওপার বাংলার নদী?
কে সে?
সে কি পঞ্চাশের সর্বোত্তমা সুচিত্রা সেন?
হে যুবাপুরুষ, তোমার নতুন কেনা বাইকের পেছনে বসিয়ে
পাড়ি দাও পথ,
যে পথের অন্ত নেই কোনও।

অন্ত্যবেলার প্রতিদিন

বুক ভবা হাওযা ছিল। ছিল পাগল কবা হাওযা।
শব্দ ছিল তুমুল ঠিক ঠিক সাইক্লোন নয। শুধুই মহড়া।
ছিল হাওবেব মহড়া। যেন চিস্কা। উথালপাথাল মযলা ঢেউ।
ছিল অন্যবকম বৈভবেব অন্যবকম প্রচ্ছদ।

একালেব জিজ্ঞাসু তরুণ—হাওব? সে আবাব কি?
ওবা তো পুকুব দেখেছে। সমুদ্র কখনও সখনও ভ্রমণে। নতুবা
টিভিব পর্দায। ছবিতে।
যাবা ষাট পেবিযে সত্তব, সত্তব পেবিযে আশিব দিকে, মৃত্যু
অভিমুখে এক পা, এক পা। তাবা তো স্মৃতিনির্ভব বড। স্মৃতি
উজাড কবে ঢেলে দ্যায সোনাব কলস।
আছে, যা কিছু তা নিযে থাকুক ওবা তাদেবই মতন।
ছিল—এই নিয়ে বেঁচে থাকা আমাদেব দেশান্তবে। এ নিযেই
আপেক্ষিক সুখের বেসাতি।
বাকি সব অব্যর্থ ঘাতক, অদ্ভুত গবল। যাবে না। শুধু
মবণযন্ত্রণা দেয় অহরক। প্রতিদিন।



তোর্ষা সিরিজ

ত্রিপুরা দর্পণ : কর্ণেল চৌমুহনী : আগরতলা
প্রকাশকাল : ২০০৬

তোর্ষা সিরিজ-২, ১০, ৪১, ৫৬ □ ১৪৭–১৫০

তোর্ষা সিরিজ-২

তোর্ষা তোর্ষা
তোর ঠাম্মার দেওয়া এই নামে প্রাণচঞ্চল নদী, তাকে তো
কখনো দেখিনি। ভূগোল বই-এ তোর নাম, তোর রূপ
মনে মনে যে ছবি তৈরি করে, তার চেয়ে সহস্রগুণ
অধিক সৌন্দর্য নিয়ে
তোর্ষা নামের ছোট্ট রাজকন্যা
আমাদের বিষণ্নঘরের বিষাদকে জানি, দূর করে দেবে।
নদী তোর্ষা তোকে হয়তো দেখবনা কোনোদিনও।
প্রয়োজনও নেই। তোর নামে নাম
আরও বেশি সুন্দর তোর্ষা যে
আমাদের ঘরেই আছে।

তোর্ষা সিরিজ-১০

ফ্ল্যাটের সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে চতুর্দিকে
কাক। এখানে, প্রেমতলার ফ্ল্যাট কম্পাউণ্ডে
কাকেদের মেলা
প্রতিদিন ভোর থেকে সন্ধে

সঙ্গে সঙ্গে তোর্ষার মুখ।
তোর্ষার বুক থেকে উঠে আসা অদ্ভুত ধ্বনি—কাঃ

এখন রাত্রি সাড়ে দশটা।
তোর্ষা তোর সেই অদ্ভুত ধ্বনি কিছুটা যেন চেনা চেনা
কিছুটা যেন অলৌকিক।

তোর্ষা, তুই এখন অন্য শহরে।
তুই কি এখন ঘুমে? নাকি বিনিদ্র চক্ষু এখনও?

তোর্ষা সিরিজ-৪১

সেদিন বৃষ্টি ছিল খুব।
হাইলাকান্দি রোড, গ্রিনভিউ নার্সিং হোমের সামনে
রাস্তায়,
জল থৈ থৈ বিকাল
এই সময়ে
বৃষ্টির মধ্যে
তোর্ষা তুই
রাজকন্যে হয়ে হাসতে হাসতে আমাদের মধ্যে।
শুধু আমরা,
অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের কয়েকজন
সেই বিকেলে, বৃষ্টির বিকেলে
রীতিমত রাজ পরিবারের মানুষ।

আজ ঠিক দু'বছর পর
কী রৌদ্র কী রৌদ্র
কী গরম কী গরম।
জন্মদিনের উৎসব, কিন্তু সত্যি সত্যি বোঝা গেল না
অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের কয়েকজন
রাজপরিবারের মানুষ কি না।
শুধু তোর্ষা তুই, সত্যি সত্যি রাণী, মহারাণী
আমাদের।

তোর্ষা সিরিজ-৫৬

সূর্য প্রচ্ছদেব ক্রিম বিস্কুট খেতে খেতে
তাকে
'ভাঙাসূর্যের' উপমা এবং পরক্ষণেই 'উঠতি সূর্যের' সাদৃশ্য কল্পনা
তোর্ষা, তিনবছর চাবমাসের তোর্ষা, একমাত্র তুইই করতে পাবিস।

এইতো সেদিন। পাগল-বাতাসের সেই সন্ধে-উত্তীর্ণ মুহূর্তে
উড়ন্ত পর্দার খোলা দরজার দিকে চেয়ে মায়ের বকুনি খাওয়া তোর্ষা
বলতে পারল—'বাতাস, তুমি এসে মাকে উড়িয়ে নিয়ে যাও'।
কাব্যময় এই অপরূপ পংক্তি, তোর্ষা, কুল্লে তিনবছর চারমাসেব
তোর্ষা, শুধু তুইই উচ্চারণ করতে পাবিস।

ফ্ল্যাটের বন্ধ দুয়ার ঘরে আপনমনে বোধ্য-অবোধ্য সংলাপ
উচ্চারণ করতে করতে হঠাৎই 'পথে আছে আমার আমি'—এই
রহস্যমুগ্ধ দার্শনিক পংক্তি, তোর্ষা, তিনবছর চারমাসের তোর্ষা,
একমাত্র তুইই করতে পারিস।



শ্রীচরণেষু বাবা

পত্রলেখা · ৯/৩ টেমার লেন . কলকাতা ৭০০ ০০৯
প্রকাশকাল : ২০০৭

বাবা

দূর ইস্কুল-বয়স থেকে
বাবা, তোমার উত্থান পতনের প্রত্যেকটি বাঁক এবং
শেষপর্যন্ত
তোমার মৃত্যুর পূর্বক্ষণ অবধি
তোমার সঙ্গে একান্তে কথোপকথন ঠিক কতদিন করেছি,
আদৌ করেছি কিনা,
মনেই পড়ে না।
হতে পারে আমাদের ছেলেবেলা, যৌবনে এটাই ছিল
অলিখিত নিয়ম।
হতে পারে, বাবা, তোমার বিরুদ্ধে ছিল
অবদমিত কোনো
অভিমান আমার।
আমি আজও, তোমার মৃত্যুর পঁচিশ বছর পরেও বলব—
আমি কোনো ভুল করিনি, সঙ্গত হেতু তো ছিলই।
সময় বদলেছে ঢের। বদলেছে রীতি-রেওয়াজ। এই বদলে
যাওয়া সময়ে,
জীবন-উপান্তে, বাবা, আমি কি তোমারই ফটোকপি নই?

মা'কে

মা,
তোমার প্রায় নব্বুই। আমার সত্তর।
এখন
এই বয়সে, দুঃসময়ে
স্মৃতি হাতড়ে দেখতে হয়
                তোমার যৌবন ও মধ্যযৌবনের মুখ আর
                দিনলিপি।

মা,
কেন এরকম হয়, বলো তো?
আমার আবেগ
আমার সমুদ্র উচ্ছ্বাস
আমার ভাললাগার শত শত অনুভূতিকে
                আমি খুঁজে পাচ্ছি না কোথাও

মা,
তুমিই বলো, দায়ী করব কাকে?
বয়সকে?
নাকি ভীষণরকমে বদলে যাওয়া এই হৃদয়কে?
মা, ব্যর্থ, এই অতি ব্যর্থ অন্ধপুত্রকে
পারো তো ক্ষমা করো।

ত্রৈলোক্যনাথ

ত্রৈলোক্যভবনে ত্রৈলোক্যনাথ নেই।
দেহ নেই। ফটোগ্রাফ ছিল। স্থানাভাবে সেও আশ্রয় নিয়েছে
চিলেকোঠায়। আবর্জনায়।
ত্রৈলোক্যনাথের স্মৃতি-তর্পণ করবে এমন একটা লোকও এই ক্ষুদ্র
সংসার ভুবনে নেই।
বউ সে তো অভিমানে অভিমানে পাথর হয়ে গড়িয়ে পড়ে
স্বস্তি পেয়েছে অনেকদিন আগে।
ত্রৈলোক্যনাথের ছিল হৃদয়-ঘাতক অসুখ। স্বর্গ অথবা নরকে
অগস্ত্যযাত্রায় গেছেন একবছরও হয়নি।
ত্রৈলোক্যনাথের মূল্যবান পদ্যপুস্তক ছিল শ-পাঁচেক, ছিল
কয়েকহাজার সযত্নরক্ষিত সাহিত্যপত্র।
কাগজওয়ালা দু'টাকা দরে সব কিনে নিয়ে গেছে।

ত্রৈলোক্যভবনে শুধু একটা জিনিসই ত্রৈলোক্যনাথের আছে,
সেটা পদবীমাত্র সার।

অনন্তবিজয়ের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

বহুব্যবহারে ক্লিশে
সেই প্রবাদবাক্যের মত, আপনি অনন্তবিজয় চাকলাদার,
আপনার নামটাও অনুরূপ
প্রহসন, প্রহসন বলতে দুর্ধর্ষ প্রহসন,
অনন্ত শব্দের তাৎপর্য সম্পর্কে আপনার তো কোনো
ধারণাই নেই। তার উপর জয় অথবা বিজয়, তা চন্দ্রবিজয় অপেক্ষাও
কঠিন এবং অসম্ভব।
তা অনন্ত বিজয়, সময় যে কখন কীভাবে টিম ইণ্ডিয়ার মতো
অসময় হয়ে গেল, তা আপনার তো বটেই, আপনার
জন্মদাতার পক্ষেও অনুমান করা সাধ্য ছিল না।
ইন্টারভ্যু বোর্ডে আপনাকে বলা হলো—আপনি ঘোড়া হন।
চোখের পলকেই আপনি, অনন্তবিজয় চাকলাদার,
ইঁদুর হয়ে গেলেন।
হ্যাঁ, অত্যন্ত নোংরা, হীনপ্রকৃতির জীব।
আপনাকে বলা হলো, আকাশের ঐ মস্তবড় চাঁদটা দেখুন।
আপনি দেখলেন এবং অবাক হয়ে বললেন—
আকাশে তো অনন্ত অন্ধকার ছাড়া
কিছুই নেই।
হ্যাঁ অনন্ত বিজয়—এই অন্ধকারই আপনার বর্তমান
আপনার ভবিষ্যৎ।

একুশ, ঢাকায়

ছুটি, না-মঞ্জুর ছুটি

কী বললে? তোমার ছুটি চাই?
কী ছুটি? ক্যাজুয়েল? নাকি কমিউটেড্?
না স্বেচ্ছা অবসর? নাকি রথারোহণের ছুটি?
নাহ্, তোমার কোনো ছুটিই আমি মঞ্জুর করতে পারছি না।
আমি চাইছি না খণ্ড অথবা অখণ্ড
                    কোনো ছুটিতেই তুমি যাও।
শেষ না হওয়া, অর্থাৎ অর্ধসমাপ্ত অঢেল কাজ এখানে ওখানে
পড়ে রয়েছে। পড়ে রয়েছে না লেখা পদ্যের
                    প্রিয় পাণ্ডুলিপি।
নাহ্, সে তুমি রাগ কর, অভিমান কর, শেষকথা,
                    তোমার কোনো ছুটিই আমি মঞ্জুর করতে পারছি না।

সেদিন বাসস্টপে

তেরো-বি বাসের জন্য তুমি ছিলে অপেক্ষাকাতর।
সেদিন বৃষ্টি ছিল, নাকি শূন্য ডিগ্রি তাপাঙ্কের নীচে
শীত, নাকি জোকোবাবাদের তুল্য গায়ে ফোস্কাপড়া
গরম, এই মুহূর্তে
মনে করতে পারছি না। স্মৃতি, অতি সম্প্রতি
মুহূর্ত অন্তর পালিয়ে বেড়াচ্ছে। পালিয়ে বেড়াচ্ছে।
আজ মনে হচ্ছে
সেদিন বাসস্টপে তুমি বলে যাকে ভেবেছিলুম, সে এক
ভিখিরি নারী।
কাল শেষরজনীর স্বপ্নে, বহু রাত্রির পর, তোমাকে
দেখলুম।
কী আশ্চর্য।
তোমার চন্দ্রমুখের আদলে সে যে অবিকল বাসস্টপে দেখা
সেই ভিখিরি নারীর মুখ।

আমার যুবক আমি

আমার যুবক আমিকে ভুলতে পারি?
জীর্ণ ঘরের ছেঁড়া শয্যায় শুয়ে একটুকরো আকাশে গুচ্ছ তারা আর
চতুর্দশীর চন্দ্রমুখ দেখা রাত্রির মধ্য-প্রহরে, ভোলা যায়?
ভোলা যায় শ্রাবণবৃষ্টির ধারাপতন থেকে দেহরক্ষার্থে আংশিক বিছানা তুলে
তক্তপোষের এককোণে বসে বসে অপেক্ষায় থাকা
কখন নির্মেঘ হবে রাত্রির আকাশ?
আধপোড়া হাফরুটি আর একটুকরো গুড় খেয়ে আশ্চর্য ডিনারের কথা
ভোলা যায়? ভোলা যায় সাতসকালে উনুনের পাশে উবু হয়ে বসে
দুধহীন গুড়ের চায়ে চাঙা হয়ে ওঠার অভ্যাসের কথা?
ভোলা যায় পাঁচ-দশ-পনেরো টাকার সম্মান দক্ষিণায় দশ-দশটি বাড়ি ঘুরে
ছাত্র পড়ানোর শেষে রাত দশটায় মাতালের মত ঘরে ফেরার কথা?
একটিমাত্র সস্তা কাপড়ের পাজামা আর সবেধন নীলমণি একটিমাত্র শার্ট
বাংলাসাবানে ধুয়ে দিয়ে গামছা পরে বসে থাকা ঘন্টাতিনেক আর
ইস্ত্রি করার জন্য বালিশের নীচে ভাঁজ করে শুয়ে পড়ার কথা
ভোলা যায়?
ভোলা যায় লন্ঠনের ম্লান আলোয় বসে পদ্যলেখা আর দু'তিন টাকার
বিজ্ঞাপন যোগাড় করে, প্রেসে ধারদেনা করে পত্রিকা করার কথা?

ভিখিরি

আমি কি খুব কম উত্তমকুমার? কম অমিতাভ?
অংকটা এইরকম : ৬৪-১৪ = ৫০, অর্থাৎ
সাকুল্যে অর্ধশত বৎসর। অর্থাৎ সুবর্ণজয়ন্তীর বছরেও
আমি। এই আমি তুখোড় অভিনেতা।

ধূসর হতে থাকা সেইসব দিনে কখনো পুত্র, কখনো ভাই,
কখনো বন্ধু। মাঝে ইন্টারভ্যাল।
স্মৃতি ততটা ফিকে হয়নি সেইসব দিনে কখনো পতি,
কখনো পিতা। কখনো স্যার। আবারো ইন্টারভ্যাল।
শেষমেষ ঠাকুর্দা। অনুষ্ঠান-সভাপতি ইত্যাদি ইত্যাদি।
টানা পঞ্চাশ বছর বিভিন্ন ভূমিকায়
অভিনয় করতে করতে, অভিনয় করতে করতে
বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলুম
আসল আমিটার কথা। কোথায় গেল সে, কোথায়?
ঐ তো আবছা অন্ধকারে একা। বসে আছে
একলা ঘরে একা।

তাকে অনুভব করার চেষ্টা করছি। কিছুতেই হচ্ছে না
কিছুই। ভাবতে অবাক লাগছে
এই সেদিন অবধি লোকটা ছিল তুখোড় অভিনেতা।
আজ নিতান্তই ভিখিরি। ভিখিরির চেয়ে আরো বড় ভিখিরি।

প্রৌঢ় লোকটা

এই যে প্রৌঢ় লোকটা
পি সি ও আগলে, জন-মনুষ্যি নেই, বসে আছে গালে হাত,
তাব যোগ্যতা বিষযে দাবা-পুত্র স্বজন আত্মীযেব সন্দেহ, যা
কদাচিৎ, কোনো না কোনো ভুলেব অনুষঙ্গে, বাগেব মুহূর্তে
ভযংকর বিস্ফোবণ ঘটায।
এইরূপ ঘটনা মুখ্য বা বিবেচ্য নয। কোনভাবেই নয। আপাত
নিরীহ লোকটাব রাগ হয। শোরাস্রোত-মনে অদৃশ্য এক
ভযংকব বাগ। তা অন্য কাবোর বিরুদ্ধে ততটা নয়, যতটা
নিজেব বিরুদ্ধে। তার সুস্থির তর্জনী সোজা নিজেরই দিকে।
অতএব, প্রৌঢ় লোকটার
বেঁচে থাকা খুব জরুরি হতে পারেনা। দুরন্ত ব্লাডপ্রেসার তো
পনেরো বছরেব দাগী ঘাতক। যে কোনো দুর্বল মুহূর্তে
হার্ট-অ্যাটাক হয়ে যেতে পারে। আর হয়ে গেলে পি.সি.ও-র
প্রৌঢ় লোকটা সত্যি সত্যি বেঁচে যায়।

পুনশ্চ উত্থিত হও

পূর্বানুমানকে
রুটলেস প্রতিপন্ন করে, তুমি জীবনানন্দ
তুমি অমিতাভ
তুমি ইরফান
মৃত্যুশয্যাকে লাথি মেরে
                    পুনশ্চ উত্থিত হও।
মিডিয়া দেখুক, লিখুক।
ভুবনে ভুবন যোগ কর ফের। হাসিতে
যোগ কর হাসি।
হ্যাঁ, পূর্বানুমানকে
মিথ্যা করে তুমি আমার গোপন অভিলাষ
তুমি আমার স্বর্গোদ্বার
                    আমার না-পাওয়া স্বপ্ন
মৃত্যুশয্যা থেকে পুনশ্চ উত্থিত হও।

তোমাকে অনুরোধ

তোমাকে বললুম—উঠে বস। বললুম—দৌড়োও।
তুমি যতিচিহ্নহীন নিদ্রায় শুয়ে রইলে। শুয়েই রইলে।
তোমাকে বললুম—প্লিজ, কিছু বলো। কম করে
দু'টি শব্দের একটি বাক্য।
তুমি, আলজিভ নেই। বোবার মত চেয়ে রইলে। চেয়েই রইলে।
তোমাকে বললুম—গান শুনবে? রবিবাবুর গান?
তুমি বধির হয়ে জন্মবধিরের মত হাত বাড়ালে।

সাক্ষাৎ শাহরুক খান

প্রেম যদি দাও—ঈষৎ অন্ধকারে একটিমাত্র চুমু।
পরিবর্তে কিনে দেব রঙবেরঙের চুড়ি, মানানসই টিপ, আর
সুগন্ধী পারফিউম। তা'ও চত্তিরের হটসেল
সস্তাদামের রিডাকশনে।
আর আমি?
নিজের জন্য কিনে নেব নজরকাড়া চটি। লেগেছে ধুম শহরময়
শব্দ উড়ছে—রিডাকশন সেল ... রিডাকশন সেল ...
রিডাকশন সেল ...।
শার্টের কলারে কয়লাখনির কালো।
কী বললে? খুলব?
যতই বলো ধুয়ে দেবে, যতই বলো ডিটারজেন্ট পাউডারের
বিজ্ঞাপনের মত দেখাবে উজ্জ্বল। তোমার সামনে খুলবই না ওটা।
তাহলে গেঞ্জিও যে নজরে পড়বে তোমার। ওটাও যে
এফোঁড়-ওফোঁড় ফাঁক-ফোকরে বুক দেখবে
হাড়সর্বস্ব।
বরং রিডাকশনের হৈ-হুল্লোড় বাজারে
হাতিঘোড়ার ছবিওয়ালা গেঞ্জি শার্ট একটা কিনে ফেলাই ভাল।
সস্তাদামের সস্তা স্টাইল দেখে মুগ্ধ তুমি
হয়তো বলেই ফেলবে—শাহরুক খান
সাক্ষাৎ শাহরুক খান!

পুরী সি-বিচ

শহর পুবীব স্বর্গদ্বাব, সি-বিচ সংলগ্ন
ভিকটোরিয়া ক্লাব হোটেলের গ্রিলঘেরা ব্যালকনির চোখে
ফেব্রুয়ারি আঠারোর এক কোন্ মধ্যরজনী?
এই এত কাছেই
জ্যোৎস্না-ধোয়া জল, অন্তহীন জল, সত্যি জল নাকি? বিস্তৃতি যার
হু-হু করা হাওয়ার তাড়নায় মুহুর্মুহু লোপাট করে
স্বাভাবিক রাত্রির নির্জনতা, নির্জনের, পৃথিবীর।

দেখা দূরত্বে রাগী সমুদ্রের অগণন দংষ্ট্রারেখা, সক্রোধ, বিপজ্জনক,
আসছে তো আসছেই। প্রতিগমনে
যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। যাচ্ছে তো যাচ্ছেই।
ভয় হয়। সুনামির ভয়। হলে হতেও পারে নক্ষত্রশাসিত মহাকাশের নিচে
এক অদৃশ্য দানব। তবু
ব্যালকনির চক্ষু জুড়ে বিস্ময়, বিস্ময়, অথৈ বিস্ময়।

সমুদ্র, পুরীর সমুদ্র

আজ পূর্ণিমা।
চাঁদ তার অঢেল রূপালি আলো মিশিয়ে দিয়েছে
পর্যায়ক্রমে উঠে আসা খণ্ড-দীর্ঘ ঢেউ উচ্ছ্বাসে।
নিমেষমাত্র।
তারপর আচানক মলিন বিষণ্নতায় ঢেকে পড়ে
পুরী-সমুদ্রের বিশাল ক্যানভাস।
নিমেষমাত্র।
পরক্ষণেই প্রথম দৃশ্য ফিরে আসে পুনশ্চ। এই
একই খেলা সাইক্লিক অর্ডারে ফিরে ফিরে আসে।
ফিরে ফিরে আসে।
ভিক্টোরিয়া ক্লাব হোটেলের চক্ষু দেখে স্বর্গোদ্বারের
রাজপথে মানব-মানবী, বালক-বালিকা হস্তে
ব্যাগ ব্যাগ উপহার।
ওরা সকলেই কিন্তু বড়লোক নয়, হতে পারে দূর দূরান্তের
গ্রাম-নগরের ভ্রমণপিপাসু মানুষ।
ব্যালকনির চক্ষু
সবিস্ময়ে দেখে বিষাদ নেই কোথাও। তাহাদের
মুখে, সমুদ্র-উচ্ছ্বাসে, বিচের পাতলা হওয়া ভিড়ে।
অদ্ভুত এক প্রসন্নতা ছেয়ে আছে পূর্ণিমা রজনীর
চতুর্ভিত। রাত্রি
এগারোটার ফুটপাত আলো করে
লাল-নীল-সাদা প্লাস্টিক চেয়ার জুড়ে
মানুষের হাতে হাতে চাউমিন, এগরোল, নিদেনপক্ষে
ওমলেট।
আজ পূর্ণিমা।
সমুদ্রের গর্জন ঢেকে দিচ্ছে হঠাৎ হঠাৎ
ছুটে যাওয়া .
টু আর ফোর-হুইলারের সশব্দচলন। ওদিকে
বিরাম নেই খেলার। সমুদ্র-খেলার।

সেই মানুষটার সন্ধানে

বিরল প্রজাতির সেই বেমানান সাচ্চা মানুষটাকে মরিয়া হয়ে
খুঁজে পেতে অস্থির হল গোটা ভারতবর্ষ।
শার্লক হোমস্ থেকে অত্যাধুনিক কম্যাণ্ডোবাহিনী চষে বেড়ালো
কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, শিলচর থেকে সৌরাষ্ট্র। নাহ্
কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।
সে কিন্তু মরে যায়নি। রাষ্ট্রান্তরেও যায়নি। এ দেশেই কোথাও
না কোথাও,
সে আছে
উজান অসমের অভেদ্য জঙ্গল থেকে অবোধ্য চম্বল। কচ্ছের
রণ থেকে ধূ-ধূ বালিয়াড়ির রাজস্থান, আগরতলার বিধানসভা
ভবন থেকে দিল্লির পার্লামেন্টভবন, দক্ষিণের বিবেকানন্দ বক থেকে
মুম্বাই-এর জনবহুল রাজপথ, গলিপথ কোথাও তাকে, সেই
বিরল প্রজাতির বেমানান সাচ্চা মানুষটাকে খুঁজে পাওয়া গেল না।
অথচ কোনো না কোনোদিন, কোথাও না কোথাও, কেউ না কেউ
নিমেষের জন্য দেখেছে বলে দাবি উঠল।
নিরন্তর তার অভাব বোধ করে একশ কোটি ভারতবাসীর
বিপুলায়তন এই দেশ। ২০০৩ সালের ভারতবর্ষের চোখে
উদাস করা এক নিথর শূন্যতা। বুকের উপর শ্বাস কেড়ে নেওয়া
বিশাল এক জগদ্দল পাথর। সে দেখছে, করুণচোখে দেখছে তার মানচিত্র অতি দ্রুত
বদলে যাচ্ছে। একশ কোটি মানুষের শরীর ক্রমশ
অসাড় ও ছোটো হয়ে আসছে।
একমাত্র সে-ই পারে, বিরল প্রজাতির সেই বেমানান
সাচ্চা মানুষটাই পারে ত্রাণকর্তা হতে। অথচ তাকে
খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও।

বর্ণমালা

হে আমার আত্মোপম প্রিয় বর্ণমালা
বহুবছরের নির্বাসন থেকে, উপেক্ষা থেকে
পুনশ্চ ফিরে এসো তুমি। ফিরে এসো
লোকালয়ে
ভিড়ে
কোটি কোটি মানুষের মুখে
এই আলো-হাওয়ায় ফিরে এসো।
বহু বছর আগে
নবাবের ভুল ফরমানে, ক্ষমাহীন ভুলে
পদাতিক তুমি হঠাৎই অহল্যা।
এই পালাবদলের দিনে
যদি দেখি
সামনে দাঁড়িয়ে সহাস্যমুখ হিমালয়
যদি দেখি দূষণমুক্ত গঙ্গা;

হে আমার আত্মোপম প্রিয় বর্ণমালা ... বলতে না বলতেই
তন্দ্রা বল
ঘুম বল
স্খলিত হল কথা। আর
স্বপ্নের মুখে দেখি জব চার্ণকের মুখ। মুখে তার
কৌতুকের হাসি।

শহর শিলচর

লোকে বলে—ঝড়ো রূপান্তর তোকে ভীষণ মলিন করেছে।
লোকে বলে—নির্ভেজাল নিষ্পাপ তুই
আকণ্ঠ ডুবে আছিস পাপে।
লোকে বলে—দুশ্চরিত্র তোর ফাঁসি হওয়া উচিত।

চোখে আমারও পড়েছে তোর অদ্ভুত নাকি স্বাভাবিক রূপান্তর আর
ক্লান্তি এসে কুরে খেয়েছে মেধা। আর শ্রাবণ-মেঘে
মন হয়েছে ভারি।

তবুও তোর ব্রণভর্তি মুখে আমার চিরস্থায়ী উষ্ণ চুম্বন। তোর
মনোহরণ মুগ্ধ অতীত এত এত বছর আজো আমাকে
প্রেমিক করে রেখেছে।

বেনামী তিন

ক.

প্রবাল মিত্তির
একমাত্র ছেলের ক্যারিয়ার নিয়ে ভাবতে ভাবতে,
ভাবতে ভাবতে,
ভাবতে ভাবতে বেমালুম ভুলেই গেলেন নিজের কথা।

খ.

তালুকদারের বউ ৩৫ নম্বর ম্যারেজ অ্যানিভার্সারির
সাত দিন পর প্রতিবেশীদের ঘুম ভাঙিয়ে সেই
পুরোনো রেকর্ড বাজাতে শুরু করলেন—কোন্ কুক্ষণে যে
এমন অপদার্থ পাত্রের হাতে আমার অপদার্থ বাবা আমাকে সমর্পণ
করেছিলেন!

গ.

সিকি কিলোমিটারে রিক্সাভাড়া দশ টাকা।
—এসব তুমি বলছ কি হে? মগের মুলুক পেয়েছ,
—বাবু উঠুন। সমিতির আপিসঘরে এর ফয়সালা হবে।



পীযূষ রাউতের কবিতা

স্বপন নন্দীর ছবি

অক্ষর পাবলিকেশনস্ : জে. বি. রোড : আগরতলা

প্রকাশকাল : ২০০৮

কিছু একটা করা দরকার ▫ ১৭৩, সত্যো আছ ভুলে আছ ▫ ১৭৪, কুসুম ▫ ১৭৫, একটি পুরোনো ছবি ▫ ১৭৬

কিছু একটা করা দরকার

কিছু একটা করা খুবই দরকার, এক্ষুনি, ভালো অথবা না-ভালো
কিছু একটা, রাগ অথবা অনুরাগের, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ঘটুক, চাই না ঘটুক,
একটা কিছু।
এইমাত্র একটা বাজে লোক, আমাকে উদ্দেশ্য করে অশ্লীল খিস্তি দিল।
না শোনার ভান করে, অর্থাৎ ভালো মানুষ সেজে হজম করে নিলুম। তবু
কিছু একটা, এই ধরো নাতিদীর্ঘ পদ্য লেখা, কৃতকর্ম বিষয়ে মনে মনে
হাহাকার করা, ক্রিকেটের প্রতিরূপ দেখা, শিশুকন্যাকে অ-আ-ক-খ
শেখানোর চেষ্টা করা ইত্যাদি ইত্যাদি কিছু একটা করা খুবই দরকার।
এই সময় একটা পাগলি ভোরের শুনশান পথ ধরে হাড়-কন্‌কনে
জানুয়ারিকে তোয়াক্কা না করে, উদোম গা, প্রলাপ বকতে বকতে
যাচ্ছে। তাহলে
আমিও কি উদোম দেহ, পাগল হয়ে, ভাবনাবিহীন, দুঃখবিহীন পথে পথে
বেরিয়ে পড়ব?
এইরকম কিছু একটা, এক্ষুনি, করা দরকার, ভীষণ দরকার।

এক্ষণ, ত্রৈমাসিক

সত্যে আছ ভুলে আছ

ছেলে ছিল বটে। ছিল না স্বাভাবিক দুরন্তপনা। নেহাতই গুডিবয়।
বেলা গড়িয়ে বিকেল। ক্লান্ত ধ্বস্ত শেষরোদ দূরের মাঠে
এখন কিছুটা। তবু বার্ধক্যের বৈশিষ্ট্য কোথায়? ঘুরে ফিরে
আসে অস্পষ্ট হতে থাকা সুপ্রাচীন সুভদ্র শৈশব। ফিরে আসে
হঠাৎ পাওয়া সেই সব মায়াচ্ছন্ন ছবি। যেন খণ্ড খণ্ড ছবি কোনও
কোনও রহস্যঘেরা চিত্রের মতো ছবি। ভালোলাগার পরিবর্তে আবার
কোনওদিন বিষণ্ণ জোৎস্না মনখারাপ অর্থে। সেইসব অনুভূতি।
আসে বারবার আসে। আর নিমাই সন্ন্যাস ছড়িয়ে দ্যায় মনে। আর,
আর সেই মুহূর্তে কেন যেন বলে ওঠে—আর কেন? মৃত্যু এসে
বলে কানে কানে বলে—চলে এসো। অধিকন্তু বলে
কেমন আছ সে তো জানাই আছে। সত্যে আছ, ভুলে আছ
আছ অদ্ভুত বৈপরীত্যে একা।

একক, চুয়াত্তর

কুসুম

কুসুম
তুমি লিখেছিলে—একবার এসো। পুজোর ছুটিতে তো
আসতেই পারো।
চক্রধরপুর নাকি ভাগলপুরে, ঠিক মনে পড়ছে না তোমাদের বাড়ি।
তোমার ঠিকানা কোনও না কোনও পুরোনো ডায়েরির পাতায় লেখা তো
ছিল।
একদিন ঠিক খুঁজে পাব।
অবশ্য যখন তুমি আমন্ত্রণ করেছিলে, তখন তোমার বয়স
                    বড়জোর বিশ কি একুশ।
সে কবেকার কথা!
সময়ের দুস্তর ব্যবধানে জনকল্লোল আগ্রাসী ক্ষুধায়
                    গিলে খেয়েছে সকল নির্জন।
কুসুম
কুসুম তুমি এখন কোথায়? চক্রধরপুর না ভাগলপুর?
নাকি অন্য কোথাও, অন্য কোনও গ্রামে বা শহরে? কোথায়?
হয়তো এতদিনে বুড়িয়ে গেছ। হয়তো কারও কারও মনে
যৎকিঞ্চিৎ স্মৃতি রেখে চলেই গেছ।

এদিকে দেখো,
ঠিকানা লেখা পুরোনো ডায়েরি খোঁজা
আমার আজও হল না। বয়সের সঙ্গে সমান্তরাল বেড়েই চলেছে
কাজের ব্যস্ততা। তবু কোনও না কোনও অনুষঙ্গে
কুসুম
কুসুম তুমি দুম করে ঢুকে পড় আমার মধ্যরজনীর ঘরে। আর
অনুযোগ কর—কই, এলে না তো তুমি।

একটি পুরোনো ছবি

কী কুয়াশা! কী কুয়াশা!
কুয়াশার বিশাল ক্যানভাস ফুঁড়ে হ্যাজাক লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোয়
টালমাটাল পা উঠে এলেন রঞ্জনদা। শরীরে শরীর ছুঁয়ে
প্রিয় বান্ধবী অঞ্জলি।
অদ্য পঁয়তাল্লিশ বছর পর দু'জন দুই পৃথিবীর নিরাকার মানব-মানবী।
রঞ্জনদা বড় বেশি সপ্রতিভ ছিল। ছিল কুশলী লম্পট। ছিল
অভিজাত মদ্যপ।
আমরা যারা, অঞ্জলির সমবয়সী, জাস্ট উত্তর প্রজন্মের তরুণ, তাদের প্রতি
রঞ্জনদার স্নেহ চা-বাগানের মনোরম জ্যোৎস্নার মতো প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও
রঞ্জনদা ছিল আমাদের অনেকের প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা
এক অঞ্জলি নয়, শত অঞ্জলিকে দেখামাত্র আমার মতো অনেকেরই
মনে হত আমিই তার যোগ্যতম পুরুষ।
পঁয়তাল্লিশ বছর পর আজও কুয়াশাঘন কোনও শীত রজনীতে
কুয়াশার বিশাল ক্যানভাস ফুঁড়ে টিলা উপত্যকার ঢাল বেয়ে
যাত্রাগানের উজ্জ্বল আলোয়, হ্যাজাক লণ্ঠনের বিভায় শরীরে
শরীর ছুঁয়ে উঠে আসেন রঞ্জনদা; বাহুলগ্না অঞ্জলি, সে তো
তোমার কিংবা আমার, কিংবা আমাদের মতো অনেকের
স্বপ্নের নারী।

একুশ, ছিয়াত্তর



চিনি কম

বুক ওয়ার্ল্ড : ১১, জগন্নাথবাড়ী রোড : আগরতলা
প্রকাশকাল : ২০০৯

চিনিকম

চিনি কমের বৃদ্ধ অমিতাভ যদি
তিরিশ বছরের ছোটো টাবুর সঙ্গে প্রেম করতে পারে তো
প্রায় সমবয়স্ক আমি পীযূষ রাউত কেন পারব না?
এই ভেবে
আমার সন্ধানী চোখ শহর এবং শহরান্তরে
গ্রাম এবং গ্রামন্তর ঘুরেও অনুরূপ কোনো প্রেমিকা পেল না।
তা অনুরূপ কেন,
ধনুক-বঙ্কিম চাঁদের মতো কোনো প্রেমিকাকেও খুঁজে পেল না।
দূর ছাই,
নিকুচি করছি চিনিকমের, অসমবয়সী প্রেমিকা এবং প্রেমের।

হে অনন্য ইডিয়ট

হে অনন্য ইডিয়ট
শহরের শশব্যস্ত ভিড় থেকে ঝিমিয়ে পড়া
গ্রাম জনপদে
গোয়েন্দা দৃষ্টিতে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।
তুমি কি বেঁচেবর্তে আছ? নাকি বেঘোরে পিতৃদত্ত প্রাণ
তুলে দিয়েছ কৌরবের হাতে?
হে অনন্য ইডিয়ট,
তোমাকে আমার ভীষণ প্রয়োজন।
তোমার বায়োডাটা, তোমার হাবাগোবা মুখের একটা
সাদাকালো ছবি, তোমার সরল-বৈখিক জীবনাদর্শ সম্পর্কে
অবগত হওয়া খুবই দরকার।
প্রায় লোপ পেতে থাকা কোনো প্রাণী প্রজাতির মতো
তোমার চরিত্র এক্ষুণি লিখে ফিকে না রাখলে
পরবর্তী প্রজন্মের গবেষণাকর্ম বিষম দুরূহ হয়ে উঠবে
কাগজে এই বিজ্ঞপ্তি দিলুম।
হে অনন্য ইডিয়ট, তুমি যেখানেই থাক না কেন,
অচিরেই যোগাযোগ করো।

আমি দাসানুদাস

এখন আমি।
এখন, অর্থাৎ দু'হাজার সাত খ্রিস্টাব্দে
বিপজ্জনকভাবে
আপাদশির বদলে যাচ্ছি।
শুধু মন নয়;
বদলে যাচ্ছে পোড়া এই দেহও।
তোমরা আমাকে যা বলো,
তর্ক না করে ভালো ও নিরীহ ছাত্রের মতো
মেনে নিই সব।
তোমরা বললে—কাল পাঁচটায় চলে এসো।
ঘুমকাতুরে আমি ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে
একঘন্টা আগেই পৌঁছে যাই।
তোমরা বললে—কাল দুপুরে প্রতিবাদ-মিছিল।
দুপুর বারোটায় টাউনহলে চলে এসো।
আমার খুব জ্বর।
ডাক্তার শুয়ে থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন।
তার নির্দেশ অমান্য করে ঠিক এগারোটাতেই
আমি টাউনহলে।
তোমরা বললে—আজ তুমি নিরামিষ খাবে।
বাড়িতে আজ আমিষের জয়জয়কার। কী নেই!
আমি খেলুম আলুসেদ্ধ ভাত।
তোমরা বললে—টিভি দেখবে না। টিভি
অপসংস্কৃতির বাহন।
সেই থেকে আমি টিভিও দেখি না।
নিজেকে ভুলে গিয়ে
আমি তাই দাসানুদাস তোমার, তোমার, তোমার।

চুপ

চুপ।
আর কোনো কথা নয়।
আর কোনো গান নয়।
ঘুমোও।
ঘুম হোক বিশ্বস্ত গোলাম।
চুপ।
ওই শোনো।
মেঘ নাকি বন্দুক।
দূরের পাহাড় হাঁটছে।
গতি বাড়ছে।
যেন দৌড়বীর।
চুপ।
তাকে বুঝতে দিও না।
সে জানুক—
মৃত্যুঘুমে শুয়ে আছো তুমি।

শিলচর, তিলোত্তমা শিলচর

বিজি লাইনে শিলচর টু কলকাতা, শিলচর টু দিল্লি যাচ্ছে দূরপাল্লার ট্রেন।
শিলচর-সৌরাষ্ট্র ফোর-লেন মহাসড়কে যাচ্ছে এয়ারকন্ডিশন ফোর-হুইলার।
যাচ্ছি আমি। থুড়ি, আমি নই। আমারই অনবয়ব দেহ। পারফিউম-
শোভিত বাহনে বুক করা হয়েছে সপরিবার আমার সুখ-ভ্রমণের অঢেল সুযোগ।
শহর শিলচরের মুখ্য-গৌণ, গলি-উপগলি প্রত্যেকটি সড়ক যেন ঝাঁ-চকচকে আয়না-মসৃণ।
প্রেমতলা পুলিস পয়েন্টের ইদিক-ওদিক জুড়ে দীর্ঘ উড়ালপুল। আমার
হাড়গোড় ভাঙা ত্রিশ বছরের প্রাচীন স্কুটার কোনো যাদুস্পর্শে যেন হয়ে গেছে
সদ্য কেনা একলাখি বাইক।
আমি প্রায় উড়েই যাচ্ছি। হ্যাঁ, উড়েই যাচ্ছি। জার্ক করছে না এতটুকুন।
আসলে যাচ্ছি রক্তমাংসের এই আমি নয়। যাচ্ছে আমারই অনবয়ব দেহ।
ডিজিট্যাল-পর্ব দু'হাজাব দুই মডেল আমার ইনভার্টার একশো টাকা
দামেও বিকোচ্ছে না। মিছিমিছি যুগশঙ্খে শ'তিনেক টাকার এড দিলুম।
কেউ কেনে না। কেনই বা কিনবে? বরাক-ড্যাম থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ
যে ভীষণ, ভীষণ রকমে উদ্বৃত্ত।
আমি; ঠিক আমি নয়, আমারই অনবয়ব দেহ, অতএব, অভিধান থেকে
লোডশেডিং শব্দটা ডিলিট করে দিয়েছে।
এখন চোখ বুজে চওড়া ফুটপাত ধরে হাসতে হাসতে হেঁটে যেতে
পারছি। কোথাও বিন্দুসম কোনো গর্ত নেই। উপরন্তু ফুটপাত বেদখল করে
রকমারি পসরা সাজিয়ে বসে নেই খুদে-ব্যবসায়ী কেউ। সকলেই পেয়ে গেছে
কর্পোরেশনের কম ভাড়ার ঘর।
শহর শিলচর এখন প্রকৃত নগরীর পদবী পেয়েছে। লোকসংখ্যা দেখতে
দেখতে চল্লিশ লক্ষ ছাড়িয়েছে। যানজটে আটকে যাচ্ছে না আমার প্রাচীন
স্কুটার। ফুয়েলের দাম যতই বাড়ুক, অযথা নষ্ট হচ্ছে না একবিন্দু ফুয়েল।
আমার দুধ-সাদা শার্ট পক্ষকালের টানা ব্যবহারেও অবিকল ডিটারজেন্ট
পাউডারের বিজ্ঞাপন। হবে না কেন? কণামাত্র ধুলো উড়ছে না ডান-বাম নগরের
কোনো প্রান্তেই।
আমার অনবয়ব দেহ তারিয়ে তারিয়ে বেশ উপভোগ করছে তিলোত্তমা শিলচরের
নাগরিক-সুখ।

আমি কি মানিক? দিলীপ, নাকি রাণা?

আমি?
আমি কি মানিক? মানিক চক্রবর্তী? সাকিন শ্রীরামপুর?
তা যদি সত্যি হয়, তো এই মুহূর্তে লেখালেখির কোনো
সুযোগই ঘটত না।
মানিক, মানিক তো গলায় কাঁটা বিঁধে সেই কবেই স্মৃতি।
আমি?
আমি কি দিলীপ? দিলীপ বসু? সাকিন রাজধানী দিল্লি?
তা যদি সত্যি হয়, তো এই মুহূর্তে সুপারিনিউসনে
বসে থাকতুম না।
দিলীপ, দিলীপ তো এখনো ছাত্র পড়াতে কলেজে যায়।
আমি?
আমি কি রাণা? রাণা ওরফে গীতেশ ভট্টাচার্য? সাকিন শিলচর?
তা যদি সত্যি হয়, তো এই মুহূর্তেই আমি
ধর্মনগরে থাকতুম না।
বাঙ্গালোর ভ্রমণে কৃতী-পুত্রের সঙ্গে সময় কাটাতুম।

রবীন্দ্রনাথ, তোমার গান

উত্তর-দক্ষিণ
পূর্ব-পশ্চিম
চতুর্দিক থেকে আক্রমণোদ্যত ধেয়ে আসছে
অগণন সন্ত্রাস।
ভয় ও দুঃখের কালান্তক মেঘ ঢেকে দিচ্ছে আলো।
আশ্রয় কোথায়। নির্ভয় আশ্রয়।
দুঃখহরণ আশ্রয়।
তার খোঁজে সাক্ষাৎ উন্মাদ
ইদিক-ওদিক দিগ্‌ভ্রান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত ছুটে যাচ্ছি আমি।
শুধু ছুটেই যাচ্ছি।
অচিন হতে থাকা এই চেনা শহরে কার বাড়িতে যেন
রবীন্দ্রনাথ, তোমার গান।
তোমার কথা ও সুরে
এ কোন্ অভয় আশ্রয়!
নিমেষমাত্রই চতুর্দিক থেকে বইতে লাগল সুবাতাস।
নিমেষ মাত্রই নির্ভয় আমি
সুস্থ হয়ে উঠলুম। নিজেকেই বললুম—বাঃ দিব্যি আমি
বেঁচে তো আছি।

একটি চেয়ার

অর্ধনির্মিত এই বিশাল ঘরের
খোলামেলা মেঝে জুড়ে রড-সিমেন্ট-টুকবো কাঠেব
ভিড়ে জ্বলজ্বল করছে
হাতলওয়ালা একটি বিবর্ণ চেয়ার।
ঠাকুরদার আমলের এই চেয়ার শতবর্ষের আয়ু নিযে
এখনও অপেক্ষায়—কেউ যদি দু'দণ্ড জিরোয।
সে দেখেছে আমার জন্ম ও শৈশব। দেখেছে
আমার তারুণ্য ও যৌবন। দেখছে
কদাক্কচিৎ বার্ধক্য আমার।
বিশ্বায়নের ঢেউ-উচ্ছ্বাস, অবাক কাণ্ড, তাকে
অদৃশ্য করে দেয় নি আজো।

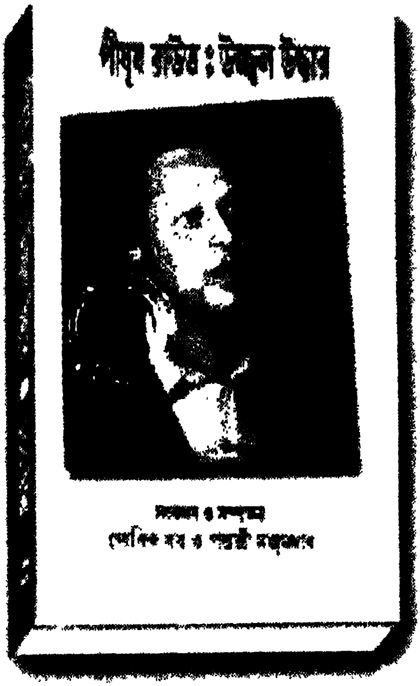
সাপ লুডো খেলা

সাপলুডো খেলতে পারঙ্গম লোকটা
টানা দুই যুগ একবারও
সাপের মুখে পড়ে নি।
ব্যাপারটা ভারি অদ্ভুত।
এই খেলার আন্তর্জাতিক কোনো প্রতিযোগিতা হলে
সে নির্ঘাত বিশ্বসেরা হত।

দুই যুগ পর
হঠাৎ যে কী হল, সেই প্রথম খেলা থেকে
অদ্যাবধি লোকটা
পড়বি তো পড়, বারবার সাপের মুখেই পড়ছে।
সাপলুডো খেলার আঞ্চলিক কোনো প্রতিযোগিতা হলে
সে প্রথম গ্রুপ থেকেই
অবলীলায় ছিটকে যেত।

ভুল বাড়ির ভুল ঘরে

ভুল বাড়ির
ভুল ঘরের মধ্যে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বাচ্চা ডাইনোসর।
পায়চারি কবছি ধাড়ি মানব আমি।
উভয়ের মধ্যে গড়ে উঠেছে
সৃষ্টিছাড়া এক অদ্ভুত বন্ধন।
বাচ্চা ডায়নোসর
আদরের ছলে কখনো সখনো কামড়ে ধরে পা।
সে এত বলবান
বদরাগী এত, মরতে মরতে কোনোরকমে বেঁচে যাই।
খেলা ভেবে
সে আবারো তেড়ে আসে। আত্মরক্ষার্থে
খোলা ব্যালকনি থেকে ঝাঁপ দিই নীচে।
হাত ভাঙে
পা ভাঙে। ঘষটে ঘষটে—এই অটো রুখ্ বলে
ডা. নন্দী পুরকায়স্থের চেম্বারে
এত বেহায়া
ব্যান্ডেজ বেঁধে আবারো সেই ঘরে, আবার সেই
বাচ্চা ডাইনোসরের সঙ্গে ...।



পীযূষ রাউত ঃ উজ্জ্বল উদ্ধার

স্রোত প্রকাশনা ঃ হালাইমুড়া ঃ কুমারঘাট ঃ উত্তর ত্রিপুরা
প্রকাশকাল : ২০০৯

মুনিয়া

শেষবার, মুনিয়া, তোকে দেখেছিলুম গাজনের মেলায়।
কখনো
রংবেরঙের সৌর-ঝিলিক কাঁচচুড়ির দোকানে, বর্ণময় হাত।
কখনো
জিলিপির দোকানে, কখনো-বা মরদের বাহু ধরে হাসিমুখ
ভিড়ের ভিতরে।
তারপরই
হঠাৎই কোত্থেকে এলো প্রবল থেকে প্রবলতর মারণ-ঝড়।
সেই যে মুনিয়া তুই নিরুদ্দিষ্ট হলি, দ্বিতীয়বার তোকে
দেখাই হল না।

স্বর্গদ্বারে প্রথম সাক্ষাৎ

তোর সঙ্গে,
যে বিশিষ্ট তোকে হাজারবার গর্ভে ধারণ করেছি। হাজারবার
উপস্থাপিত করেছি প্রিয় বর্ণমালায়, কবিতায়, সেই তোর সঙ্গে
প্রথম সাক্ষাৎ পুরীর স্বর্গদ্বারের পথে।
তোর দিগন্ত সরলরৈখিক নয়। অত্যল্প হলেও খানিকটা
অর্ধবৃত্তাকার।
গাত্রবর্ণ কখনো ফিকে নীল, কখনো গাঢ় নীল, কখনো বা
অন্ধকারাচ্ছন্ন কালো।
অদূরবর্তী বেলাভূমিতে তোর মুহুর্মুহু সহর্ষ আবির্ভাব,
আত্মপ্রকাশ, সেই বিশিষ্ট তোকে নিয়েই বহিরাগত
নরনারী আজ শিশুমুখের উচ্ছ্বাস।
রাত্রি এখানে বিলম্বিত।
রাত্রির রহস্য ফুঁড়ে লক্ষ লক্ষ, নাকি সংখ্যার অতীত
দুধসাপ হিস্ হিস্ শব্দে ছোবল মারে।
কিন্তু কী অদ্ভুত কাণ্ড। নিমেষের মধ্যে উধাও। অলৌকিক
কোনো সাপুড়ে যেন তড়িৎ দক্ষতায়-তোকে ঝাঁপবন্দী করে।
কিন্তু কতক্ষণ?
তারপর আবারো, আবারো, আবারো আক্রমনোদ্যত
হাজার হাজার দুধসাপ।

আবারো আটান্ন

সেই   অনতিগভীর জঙ্গলে চড়াই এবং উৎরাই
সেই   বাইসাইকেল চালক লিকলিকে তরুণ
সেই   ঝাঁ ঝাঁ করা চা-বাগানের মধ্যাহ্ন-রৌদ্র
সেই   বাগানবাবুর কোয়ার্টারে লিপটন-মৌতাত
সেই   পোলিও-আক্রান্ত এক পা খোঁড়া তনুদার মুখে
                    জলজ্যান্ত হেমন্ত মুখুজ্যে
সেই   শাসনবিহীন অবাধ স্বাধীনতার বেলেল্লাপনা

প্রায় অর্ধশতক বৎসর পর
আজো বেঁচে আছে প্রবীণ কবির কবিতায়
আর মধ্যরজনীর নিঃসঙ্গ ভাবনায়।

সেই   জ্যোৎস্নারাত্রির সাহিত্যসভা বাগান-সন্নিহিত
সীতাংশু পালের কেরোসিন টিনের একচালা ঘরে।
সেই   অপবিসর ঘর আলোকিত করে বুকসেল্‌ফে
বসে আছেন সমর-জীবনানন্দ থেকে শঙ্খ-অরুণ
এবং অপেক্ষাকৃত নবীন শক্তি-সুনীল-শরৎ
সেই   গ্রাম যেন অন্য এক অখ্যাত চাইবাসা।

এক্ষণ, তিরানব্বই

মৃত্যু, টেলিফোনে

শরৎ-পূর্ব টেলিফোন কি কসম খেয়েছে এবার শুধু
মৃত্যুসংবাদই শোনাবে?
এই তো সেদিন যৌবনসঙ্গী প্রশান্ত ধর আগাম জানান না দিয়ে
দুম্ করে মরে গেল।
প্রশান্তর বৌ অর্চনা প্রায় একযুগ পর
হঠাৎই ফোন করে বলল—আপনার বন্ধু আর নেই।
অসুখবিসুখ কার না হয়, তাই বলে সত্তরের আগেই চলে যাওয়া!

আমার অসমবয়সী বাল্যসঙ্গী ছোটপিসিমা মাত্র এক রাত্রির
নির্ঘুম যন্ত্রণার পর সাতসকালে প্রায় সুস্থ
বাথরুমে গিয়েই অজ্ঞান;
জ্ঞান আর ফিরলই না। ধরাগলায় অনুর ফোন।

উদ্বেলিত কণ্ঠ সৈকত ফোন করে জানাল দীর্ঘ রোগভোগের পর
আজ সকালেই সমরদা ...।
জন্ম-রোম্যান্টিক এই মানুষটা ফিল্মের হিরো হতে চেয়ে
শেষপর্যন্ত বিহার-ওড়িশার কয়লাখনিতে এবং শেষমেশ
কলকাতার এক হোমে।

ভালোমানুষ সুধীনের ফোনে বিস্ময় ও বিষাদ।
পরোপকারব্রতী প্রাণচঞ্চল বিধান ব্যানার্জি কাজের অবসরে
হাসতে হাসতেই মরে গেল। অন্ধ বধির অনাথ শিশুদের
পিতা এই মানুষটা আচানক চলেই গেল।

তন্মুহূর্তের একটি ছবি

আধহাত দূরত্বের সেন্টার টেবিলে
অবিন্যস্ত ভিড় করে আছে একটা অপেক্ষাকাতর মোবাইল,
কভারছেঁড়া একটি দেশ, দুটি অতি চমৎকার লিটলম্যাগ,
দুটি দৈনিক আরোহণ, সাময়িক প্রসঙ্গ। একটা প্রায়
শেষ হওয়া সস্তাদামের ডটপেন, চশমার ফ্রেম, একটা
ছোট চাইনিজ টর্চ কাম লাইটার। আর অতি অবশ্যই
চুন-জর্দা-সুপুরিসহ প্লাস্টিক পান-বাক্স।

এই তালিকার একটাও এই মুহূর্তে কোনো কাজে আসছে না।
মুহুর্মুহু পালিয়ে বেড়ানো বিদ্যুৎ করতে দিচ্ছে না
কোনো কাজ। না পড়তে না লিখতে কিছুই না।

বাকি রইল পান। ডাক্তারের বারণ কে শোনে। বউ
করতে করতে ক্লান্ত হয়ে এখন আর কিছুই বলেনা।

এই অব্দি লিখেই মনে হল জম্পেশ করে জর্দাসহযোগে
একটা পান মুখে দেওয়া যাক। এই আলো-অন্ধকারে
লুকোচুরির মধ্যেই একটা খিলিপান বানাতে
ব্যস্ত হয়ে উঠলুম।

বাংলা অভিধান চুরি হয়ে গেল

মনে হল। হঠাৎই।
ঘড়ির কাঁটা যখন বারোটা ছুঁইছুঁই, মনে হল
আমার বাংলা অভিধান চুরি হয়ে যাচ্ছে, নচেৎ পরী হয়ে
খোলা দরজা পথে পালিয়ে যাচ্ছে।
ধর ... ধর .. ধর ... তড়িঘড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠতে গিয়েই
পড়ে গেলুম
পায়ে অসহ্য ব্যথা। তবু খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে গিয়ে
যেই না তাকে ধরেই ফেলেছি প্রায়, হাতের মুঠোয়
আটকে পড়ল গুটিকতক ছেঁড়াপাতা।
চোরের অদৃশ্য হাত শূন্যে ভাসাতে ভাসাতে নিয়ে গেল
আমার সাধের বাংলা অভিধান।
হাতের মুঠোয় অকিঞ্চিৎকর যা রইল, তা নিয়ে
লেখাজোকা যায়?

আমি খোঁড়াতে খোঁড়াতে ফটক খুলে পথে নামলুম।
রাত্রির বিজন পথ পড়ে পড়ে অকাতর ঘুমুচ্ছে। গুমোট
আর মনখারাপ আকাশ। বৃষ্টি হলেও হতে পারে।
স্ট্রিটলাইটে নগর-পঞ্চায়েতের ব্যয়-সংকোচ। চোরকে যে
তাড়া করব; পুনরুদ্ধার করব বাংলা অভিধানকে
পরিস্থিতি তার সুযোগই দিল না।

আগুন বাইবে ও ভিতবে

কথা ছিল টানা দুর্যোগেব পব
জীবনটা অন্যবকম হবে।

হলনা।
টাযাব পোড়ানো আগুন। সেও জ্বলছে না তেমন।
এবাব জব্বব শীত।
হাত গুটিয়ে যাচ্ছে জঠবে। কিনে আনা হল তিনলিটাব
কেবোসিন।
ভস্মে ঘি ঢালাই সাব। জ্বলছে না। কোনোভাবেই জ্বলছে না
আগুন।
কথা ছিল টানা দুর্যোগেব পব
হেসে উঠবে জীবন।
হলনা।
বুকেব ভিতব দাউ দাউ জ্বলছে বাবণেব চিতা।
আঁসুক বৃষ্টি তেড়ে
আসুক হাজাব কর্পোবেশনেব দশহাজাব দমকল।
নিভবে না তবু।

ভুল দর্শন

নিম্নচাপ সৃষ্টি কোন্ আগাম-সুনামি সতর্কতার খবর
ছাপেনি কোনো দৈনিক। টেলিভিশনের প্রত্যেকটা
নিউজ চ্যানেলও শোনায়নি কোনো অশুভ সম্ভাবনার
সংবাদ।
ঝড় কিন্তু উঠল। এরকম ভয়ঙ্কর গত পঞ্চাশ বছরেও
কেউ কখনো দেখেনি।
শহর এবং সন্নিহিত প্রায় গ্রামান্তরকে চমকে দিয়ে
ঘটে গেল সমূহ সর্বনাশ।
ঠিক যেরকম নির্বাচনপূর্ব এবং সদ্য নির্বাচনোত্তর
সমীক্ষার প্রমাণিত মিথ্যা।
একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলের লাখো চক্ষুকে প্রবঞ্চনা করে
ঘটে গেল বিশেষ এক প্রজাতির সমূহ সর্বনাশ।
আসলে এই আপ্তবাক্যটাই সত্য। চোখ যা দেখে
কান যা শোনে তা সর্বাংশে সত্য নয়।

ভবিতব্য

ঘোরের মধ্যে ঘটে যাওয়া
আমাদের কিছু কিছু ভুল
আমাদের কিছু কিছু পাপ
আমাদের সম্মিলিত স্বপ্নকে
সূর্যতৃষ্ণা তীব্র খরার মধ্যে
মৃত্যুদূত শৈত্যপ্রবাহের মধ্যে
উদোম শরীর অনাথ করে
ছেড়ে দিয়েছে।
মৃত্যু তো জীবনের স্বাভাবিক উপসংহার। তো
কোন্ মৃত্যু?

সুখের ঘরে ভাঙা তক্তপোষ, সেলাই-নিন্দিত
ধূলিমলিন পোশাক আর শূন্য হেঁসেল—
এই আমাদের সম্মিলিত স্বপ্নের ভবিষ্যৎ।

তবুও শূন্যতা

গতি অত্যন্ত ধীরবহ
তবু অস্তিত্ব রক্ষণের প্রাথমিক নির্মাণ পর্বের কতোটা
হয়ে গেল। হয়ে তো গেল। তবু কোথাও না কোথাও
বিপরীত ভাবনার ক্রন্দন।
তোকে নির্বাক করে তোলে এবং
অবশ্যই নিষ্প্রাণ পাথর।
আশানুরূপ কিছু হবার তো ছিলনা। অঢেল ভুল ছিল
গোড়ায়। সে হয়তো তোর নিজেরই।
ধরা যাক কাজটা হয়ে যাচ্ছে।
অথচ ফ্রেমের ভিতর হা-হা করা শূন্যতায়, সাগরপারে
ঢেউধ্বস্ত জেলেনৌকোর ভগ্নাবশেষের উপরে
বসে আছে নিঃসঙ্গ গাঙচিল।

অন্যরূপা, আপনাকে

অন্যরূপা,
আপনাকেই বলছি।
                    সর্ব বিষয়ে
আপনার নেতিবাচক ভাবনা। আপনার হাস্যকর
ভয়ভীতির বেআব্রু প্রকাশ। আপনার এবংবিধ বাক্য
এবং বাক্যসূঁচে আহত হৃদয়
এমনভাবে
দিনের পর দিন
বছরের পর বছর
বোবা হতে হতে, অধমের অন্তরাত্মা, যা কিনা
স্বভাবতই অদৃশ্য
মৃতবৎ পড়ে রয়েছে যে বাড়িতে, গৃহাভ্যন্তরে,
শান্তিনিকেতন তাকে বলা যাবেনা কিছুতেই।

ক্রমশ

বোবা বর্ণমালা

লোকে বলাবলি করছে—যাক্ বাপু ছেলেটার একটা
হিল্লে হল। উল্টোকথাও শোনা যায়। পথের ফকির তো
নয়। কী দরকার ছিল এই সরকারী বদান্যতার!
শেষাবধি ইতিবাচক, জীবন প্রাসঙ্গিক কিছু কি হবে
কে জানে।
মধ্যরজনীর চেতনা-প্রদেশ তোলপাড় করে অসোয়াস্তির
ঢেউ।
বিষণ্ণতার অলৌকিক ক্রন্দন শোনা যায়, শোনা যায়
কেন এরকম হয়?
কেন হচ্ছে? জানি প্রশ্নোত্তর দেবেনা বোবা বর্ণমালা।

এই ঘর এই বাড়ি

একজন প্রবীণ ও একজন প্রবীণার পক্ষে
দেড়হাজার বর্গফুটের চার কামরার এই ঘর
বিশাল এক শুনশান প্রান্তর।
প্রভূত নির্জনতা আর প্রায় একলা থাকার
এরকম সুযোগ আর উপকরণ দ্বিতীয় কোথায়?
আর দু'জনের পক্ষে ভালোলাগার?
সে যদি হত দূরের অতীত, স্বীকৃতি মুহূর্তমাত্র
বিলম্বিত হতনা মোটেই।

একজন প্রবীণ ও প্রবীণার পক্ষে
এই ঘর এই বাড়ি এই সংসার
ভীষণ ভালগার, বড়ই নিষ্ঠুর, বড়ই নির্মম।

তবু নির্জনতার এই উৎপাত মন্দের ভালো।

আগুন ও মুক্তি

আগুন। যে আগুন অদৃশ্য
পোড়াচ্ছে তোকে। পোড়াবে [illegible]
পোড়াবেই তো।
জেনুইন মূর্খ যাবা, তাদেব দশাপ্রাপ্তি [illegible]
                    এইবকমই।
মূর্খ যাবা, ভুল তো তাদের সহজাতই।
ছোট ভুল, ছোট ছোট ভুল
                    বড় হতে হতে
ভুলেব সমুদ্র।
সাঁতাব তো জানা নেই।
অবশ্য ডলফিন যদি থাকে, একটু আধটু শ্বাসগ্রহণেব সুযোগ
কবে দিতে পাবে।
নিস্তাব তবুও নেই। চর্মবোগ নির্ঘাৎ।
হতে পার প্রতিবন্ধী। এবং এভাবেই
                    বেঁচেবর্তে থাক।



হ্যালো চীফ্ মিনিস্টার

বহ্নিশিখা পাবলিকেশন ঃ ধর্মনগর ঃ উত্তর ত্রিপুরা

প্রকাশকাল : ২০০৯

বিশ্বায়ন

বিশ্বায়নের খাই খাই ভয়ংকর আগুন
জ্বলছে নিরন্তর।
পুড়ছে ভালোবাসা।
পুড়ছে বিশ্বাস।
পুড়ছে ঐতিহ্য।
পুড়ছে ঘর-গেরস্থালি, প্রেম।
চতুর্দিকে অ্যালবাম। ঢের মনোরঞ্জন
হেথায় হোথায় সব ঠাঁই।

বিমল, বিমল সিনহা

ইয়াংকি ফিল্মেব হি-ম্যানসুলভ তাগড়া দেহ
ববীন্দ্রসদনেব সাহিত্যসভাব চক্ষুকে বাববাব, বাবংবাব
আকর্ষণ কবে। সে কিন্তু মঞ্চে দাঁড়িয়ে
কবিতা পড়েনি। তবু
তবু এতো আকর্ষণ এতো আকর্ষণ।
দাপুটে মন্ত্রী হয়েও সে কিন্তু তথাকথিত মন্ত্রী ছিল না।
লোকে বলে
চায়েব দোকানে আমজনতাব ভিড়ে প্রথাভাঙাব প্রথায়
সে ছিল অদ্বিতীয় জনপ্রতিনিধি,
সে মুহূর্তেব জন্যেও ভোলে নি সেইসব অরাজনৈতিক
বন্ধুদেবকে,
যাবা স্কুলে-কলেজে সহপাঠী ছিল।
অদ্বিতীয় সে মাত্র পঞ্চাশেই আভাঙার অভিশপ্ত ভূমিতে
বুলেট-বিদ্ধ হয়ে স্মৃতি হয়ে গেল।

একটি যুবকের সংসার

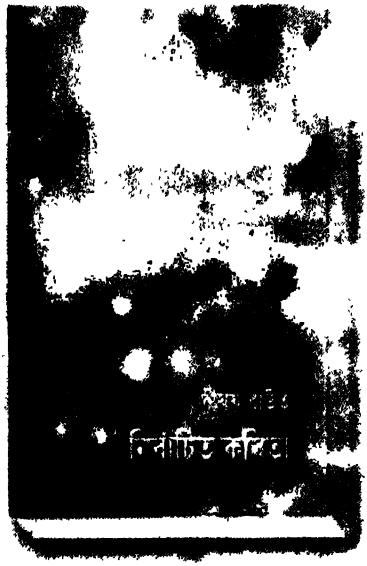
ধিকি ধিকি আগুনের মত জ্বলছে এইসব রুখুসুখু দিন।
দেখতে দেখতে ছায়া দীর্ঘতর হয় পুবের
এবড়ো-খেবড়ো মাঠে।
অবসন্ন তনু, ফিরে আসে অন্ধকার গুহাঘরে অর্ধমৃত যুবক।
প্রায় ফুরিয়ে আসা মোম জ্বেলে যুবক আপাত দূর করে
প্রেত অন্ধকার।
লক্ষ্য করুন, উপকরণ বলতে
আছে ছেঁড়াখোঁড়া মাদুর এবং ছন্দমিল সহযোগে
একটা তেলচিটচিটে ওয়ারহীন বালিশ ও শতচ্ছিন্ন কাঁথা।
দাঁত মাজতে গিয়ে উনুনে হাত দ্যায় যুবক। উঠে আসে
একমুঠো ছাই। তার মনে পড়ে—এই তিনদিনে তার একটাও
কাঠ পোড়ে নি, পুড়েছিল শুকনো কিছু ছিন্নপত্র এবং
কুড়ানো কাগজ।
না, তার মনখারাপ হয়নি।
এতো বহুল ব্যবহৃত পুরোনো অভ্যাস। সহ্যশক্তি তার
সমানে পাল্লা দিয়ে গেছে
একটা পাথরের সঙ্গে, সারবান বৃক্ষের সঙ্গে—শরীরে যার
কুঠারও বিঁধে না।
একসময় মোমের সর্বশেষ উজ্জ্বল আলো দপ্ করে নিভে গেলে
যুবক খুব নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে।

আবারো ঘর হবে

বলব না অঘটন ঘটবেই।
তন্মুহূর্তে অন্তরাত্মা বলে ওঠে, অঘটন কেন? বরং বলব
কোনো না কোনোদিন ঘটনা ঘটবেই।
ত্রিপুরার অরণ্যদর্শনে আবারো আসবেন রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ।

তিরিশ লক্ষ মানুষের উদ্বেগ
চিরায়ু হবেনা।

বসতি গড়ার দুঃখ তো চিরকাল দুঃখ হয়ে থাকবে না।
আবারো ঘর হবে।
মনু-গোমতী, ধলাই ও খোয়াইয়ের তীরে
পাহাড়ের হাটেগঞ্জে ভিড়
আবারো গম গম করবে।
তৈদু, লংতরাই, খেদাছড়ায়
অল্‌কা ইয়াগ্‌নিক আর কুমারশানুর ক্যাসেট বাজিয়ে
পিকনিকে যাবে হাজারো তরুণ।



অগ্রন্থিত (বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত)

প্রকাশকাল ২০১০

ষাটের দশকের কবিতা ঃ

শূন্য দশকের কবিতা ঃ

কবুতর

একদা জনৈক জ্যোতিষী বলেছিলেন —তোমার ভাগ্য নিতান্তই মন্দ হে।

বিমল জানিস তো, নেহেরু শান্তির জন্য কবুতর ওড়াতেন।

তারপর
নেপথ্যে টুকরো সংলাপ ঃ কেমন আছো?
দিগ্‌বিদিকে ভারতবর্ষ শান্তির বাণী পাঠিয়েছে। শান্তি মানেই তো
কবুতর। সিলেট শাহ্‌জালালের দরগায় প্রচুর কবুতর দেখেছিলাম।
আমি তখন খুব ছোটো। দেখেছিলাম, সুর্মা নদীর ব্রীজে কবুতর।
আমি তখন খুবই ছোটো।
বিমল জানিস তো, নেহেরু শান্তির জন্য কবুতর ওড়াতেন।
কবুতর মানেই তো পায়রা। তক্ষুণি মনে পড়ে মায়ামৃগের গানটা ...
ও বক্-বকম্-বকম পায়রা। নেপথ্যে গ্রামোফোনে আহ্
কবুতরের মাংসে আমাদের দারুণ লোভ; চকচকে জিহ্বার মধ্যে
জল জমে ওঠে। কবুতর। সাতলক্ষ কবুতর!
বিমল জানিসতো, নেহেরু শান্তির জন্য কবুতর ওড়াতেন।
ইদানিং ঐসব কবুতর কঙ্কাল সম্বল করে যাদুঘরে, কাচের
টেবিলে সুদূর অতীত। ম্লান গন্ধের মধ্যে সুদূর অতীত। কিন্তু
ইনক্লাব, জিন্দাবাদ ঐ কিসের শব্দ? কারা সব
যাদুঘরের গেটে ভিড় করে আছে?

তারা কি শান্তির জন্য ভগ্নদূত অথবা নিতান্ত দর্শক?

বিমল জানিস তো, নেহেরু শান্তির জন্য কবুতর ওড়াতেন।
অথচ
কী অসহ্য প্রহসন দ্যাখ, আমারই পূজনীয় পিতার বক্ষে
করতলে দারুণ ঘৃণা। মনে পড়ে,
একদা জনৈক জ্যোতিষী বলেছিলেন—তোমার ভাগ্য নিতান্তই মন্দ হে।
ঘৃণা শব্দের সঙ্গে ঔরংজেবের কী একটা নিবিড় সম্পর্ক---যেমন
আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার—আমি অনুভব করি।
হে ঔরংজেব,
এই রক্তের মধ্যে জিঘাংসার আগুন জ্বেলে তুমি কি পাইচারি করছ
বারান্দায় ঝুঁকে পড়ে ইতিহাস—বধ ভূমির অট্টহাসি,
প্রজাবৃন্দের তৎপরতা—যে যেদিকে পারো ছুটো।
বিমল জানিসতো, নেহেরু শান্তির জন্য কবুতর ওড়াতেন।
অথচ কী অসহ্য সুখের মধ্যে কবুতরের মতো বিমান যখন
প্রচণ্ড গতির মধ্যে আকাশে উড্ডীন—হ্যানড্‌স আপ্ ক্যাপটেন্।
ইদানিং কল্যাণপুরে দারুণ সব পাপপুণ্যের খেলায়
ঘটনাপ্রবাহে
কত কত স্মৃতির মধ্যে ভুলে যাই; একদিন কারা সব বন্ধু ছিলো।
প্রিয় বইগুলো কখন যে চুরি গেছে—কিছুই জানিনা।
শুধু ট্র্যাজিক দৃশ্যের মধ্যে হো-চি-মিন কাচের পাত্রে
কবরে গেলেন।
বিমল জানিসতো, নেহেরু শান্তির জন্য কবুতর ওড়াতেন।
অথচ এই ১৯৬৯ দু'চোখে প্রবল ঘৃণা; নগ্ননখর দৃশ্যে
কবুতর ফসিলমাত্র। ধর্মঘটে ভাঙা শঙ্খের শব্দ নিছক
শব্দের জন্য এবং অবশেষে ফলশ্রুতি কিছু? ইদানিং
সমুদ্রের ঝড়ে ঝড়ে টালমাটাল নৌকোর মতো সাতলক্ষ
কবুতর; টালমাটাল দেহ—উঠছে, পড়ছে ছত্রাকার
সুরম্য মিছিল।
স্বপ্নের হিমেল হাসির মতো স্থলভাগ, পাগল সমুদ্রে
প্লাস্টির নারীর মুখ শো-কেসে বহুমূল্য মিথ্যাহাসি,
সাদর আহ্বান—এইখানে আসুন।
স্থলভাগ, বিন্যস্ত কবুতর; বস্তুত প্রশান্ত জীবন
বহুদূরে—প্রবল ঝড়ের মধ্যে নির্বাসিত অন্ধকার দ্বীপ।

যুদ্ধযাত্রা

যখন সম্পূর্ণ একলা নিত্যানন্দর চাযের দোকানে বসে সিগারেটের পর সিগারেট কয়েক কাপ চা উজাড় হতে হতে ক্রমে সিগারেট ও চাযের প্রতি বিস্বাদ অনুভূত হলো এবং একটা অদ্ভুত বিষণ্ণতায ডুবে গেলাম তখন বাইরে রাস্তার নীচু গর্তগুলোতে ভিজে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে মেঘগুলো দ্রুত পাল্টাচ্ছে এদিক-ওদিক তখনি মনে হলো অন্তত একটা বন্ধুও যদি আমার পাগল ইচ্ছার সঙ্গে যে কোনো দুর্যোগে বলতে পারতো চল্ তোর সঙ্গে যে কোনো জাহান্নামে নিত্যানন্দর জানালাবিহীন কেবিন থেকে যে কোনো মহিলার বাড়ীতে চাই কি মদের দোকানে এবং ব্রথেলসেও ঠিক ঐ সময় আমার প্রিয় বন্ধুরা খাঁটি সৈনিকের মতো সশস্ত্র ছুটে এসে আমাকে বললে—আমরা প্রস্তুত সমস্ত ঘরময় প্রতিধ্বনিত হলো আমরা প্রস্তুত আমরা প্রস্তুত আমরা প্রস্তুত আমিও ছুটে এসে ওদের হাত থেকে আমার জন্য সংগৃহীত পোষাক ও অস্ত্র নিয়ে হুংকার দিলাম—এসো এই ভাল্‌গার পৃথিবীর বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করি

আমার সিদ্ধান্ত অতঃপর সমর্থিত হয়ে গেলে বাইরের ভিজে জ্যোৎস্নায় এই ছোট্ট শহরের বাড়িতে আমাদের যুদ্ধযাত্রার খবর আকাশবাণীর সংবাদের মতো ছড়িয়ে পড়ল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি ও আমার সৈনিক বন্ধুরা যুগপৎ দেখতে পেলাম মার্টিনবার্নের আঠারোতলার ছাদ থেকে আমরা ক্রমে ক্রমে লাফিয়ে পড়ছি আর যুদ্ধক্ষেত্রের বিউগল ও হিংস্র আর্তহাহাকারে ঘন ঘন কেঁপে উঠছে চতুর্দিক

পোস্টার পোস্টার

পোস্টার পোস্টার
ওহে সুব্রত মিত্র, পোস্টারেব চওডা পথ ধবে
হন্‌হনিয়ে যাচ্ছেন কোথায়?
ও মশাই শুনছেন, এই পথই কি
                    শেরশাহ্ বানিয়েছিল?
কী নাম বললেন—গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড?
পোস্টার পোস্টার
অতঃপর, পোস্টারের মধ্যে
সুব্রত মিত্রকে দেখলাম।
রক্তাক্ত বীভৎস বিজয়ীর মতো
                    বুকের ওপর
টাটা মার্সিডিজ দাঁড়িয়ে।

পীযূষ রাউত এবং তার অন্যান্য বন্ধু

আমার জন্ম ১০ই নভেম্বর ১৯৪০ শনিবার রাত ৩টা

সমগ্র বিশ্বময় তখন		আগুন যন্ত্রণা আগুন যন্ত্রণা আগুন
আমার ঘরে তখন		সুখ শান্তি সুখ শান্তি সুখ
মায়ের চোখে		জীবনের শ্রেষ্ঠতম দিন
বাবার চোখে		পুরুষের শ্রেষ্ঠ অহংকার।
আজ এই মুহূর্তে যীশুর জন্মের পর পৃথিবীর বয়স যখন ১৯৬৭ বৎসর
৩ মাস ১৩ দিন, আমি তীব্রভাবে চমকে গিয়ে তোমার দিকে পিছন
ফিরে তাকালুম **মানিক, স্বপন, প্রদীপ, তনুদা, মনু,**
কোলকাতার **ননী কুণ্ডু, মলয় মণ্ডল।**

প্রায়শই তোমাদের চিঠির এভারেজ
এইভাবে লিখে নিতে পারি ঃ শরীরটা ভালো নয়, মনটাও।
আশ্চর্য কী যে অসুখ।		আমিও অসুস্থ।
সারা শরীরময়		জলবসন্তের উদ্গত মুখ
সারা সুখময়		ম্যানহোলের পচা দুর্গন্ধ
সারা মনময়		যন্ত্রণা যন্ত্রণা যন্ত্রণা যন্ত্রণা ৭লক্ষ
বৃশ্চিকের অমোঘ দংশন।

প্রদীপবাবু—আপনার 'আলজিব থেকে রক্ত ঝরে'
তাপস বাবু—আপনার 'জন্মনিয়ন্ত্রণ'
উদয়ন বাবু—আপনার 'ঘটোৎকচী-র বিজ্ঞাপন
ইত্যাদি দারুণ সত্যি বলে
আমার চেতনায় বিবর্ণ আত্মার আর্ত চীৎকার ক্রমশ ধ্বনিত হতে হতে
১০২ ফুট গভীর কূপের ভিতর
আমি, আমরা, এ-যুগের সমস্ত যুবকেরা।

('বিবর'-এর জন্য সমরেশ বাবুকে ১০০১ আন্তরিক ধন্যবাদ)

অনাবিষ্কৃত ওষুধের জন্য

আমার পাতলা এবং রোগজীর্ণ শরীরের সর্বাপেক্ষা কোমলস্থানে
সেই কবে বছর ১৫ আগে প্রথমবাব একটা নেড়ি কুকুর
কামড়েছিল।
২য় বাব ২৫শে জুন, ১৯৬২। ৩য় বাব ১৮ই মাঘ, ১৯৬৫
ডাক্তারবাবু (এই মুহূর্তে তাপস শীলেব 'জঠব' এব ছবি মনে পড়ছিল।
শুনুন, আমার বোধহয় সেই থেকেই একটা কঠিন অসুখ।
আমি অতএব একটা অনাবিষ্কৃত ওষুধের জন্য ভীষণ প্রয়োজন
অনুভব করছি।
বোগজীর্ণ শরীব। নেড়ি কুকুর + কঠিন অসুখ > অনাবিষ্কৃত ওষুধ
আমার জাগ্রত চেতনায় হিম হিম মসকোর শীতের মতো একটি
ভয়ংকর সরীসৃপ। বুঝলে স্বপন জীবনটা ফুবিয়ে যাচ্ছে।
আতসবাজির মতো আমার এই দুর্দান্ত এবং অসৎ যৌবনটা পুড়ে
ছাই হয়ে গেলো।
পাগল গফুর আলীর চোখে এখন হামেশাই দুপুব ১২টায়
রাত্রি দ্বিপ্রহর আর অবিরাম চীৎকার 'শালা বাঞ্চোৎ তোকে
দেখে নেবো'। পাগল গফুর আলীর মতো আমিও মাঝে মাঝে
ঠিক ঐ রকম চীৎকার দিই; কোন্ শা' আমার চোখে
এতো অন্ধকার দিল, নারীর মতো কুটিল অন্ধকার, জঠরের মতো
গভীর অন্ধকার, পরজন্মের মতো নীল অন্ধকার!
কেউ কখনো আমাকে ভালোবাসেনি বলে, কেউ মমতাময় কণ্ঠে
কিছু বলেনি বলে, আমার বলতে ইচ্ছে করে। শুনুন, ফিরে দেখুন
সুরত্‌খানা মন্দ নয়, **ইয়াহু চাহে কোই মুঝে জংলী কহে ...**

অদূরেই ৫০

বাবা হারু, আমার বানপ্রস্থ গমনের সময় হলো।
ট্রেনের হুইসেল শুনছি। অমৃতযোগ দিবা ৪।২৮।৭ গতে
৬।৪১।১৯ মধ্যে। শুনছো, আমার লোটা কম্বলটা ঠিক করে দাও।
স্বগত
বুকের গোলাঘরে শেষ মাড়াইয়ের ফসল শেষ হয়ে গেলো।
এখন নির্বাপিত আলোকে আমি অসহায়, নির্বোধ, কাপুরুষ
(নাকি নপুংসকও)।
বৌ বলেছিলো—কী সব পাগলামি হচ্ছে, মেয়ে তোমার আইবুড়ো,
ছেলেটারও একটা হিল্লে হলোনা।
আমার মাথার ভিতরে ছেলেমেয়ে মেয়েছেলে
ছেলেমেয়ে মেয়েছেলে ক্রমাগতই দার্জিলিং এক্সপ্রেসের
শব্দ তুলছিল ঝিক্ ঝিক্ ছেলেমেয়ে, ঝিক্ ঝিক্ ছেলেমেয়ে,
ঝিক্ ঝিক্ ছেলেমেয়ে
ওহে ও গোলক, তোর মা ঠাকরুন কী বলছে শোন্।
গোলক নিরুত্তর।
পুনশ্চ স্বগত।
আমার মনে হলো কোন মাঠের নিরাবলম্ব শূন্যতায় আমার জাগতিক চেতনা
মৃগীরোগীর মতো মুখে থুথু এনে টুইস্ট দিচ্ছে।
আমার কোন্ পূর্বপুরুষ কবে নাকি ঝর্ণা দেখেছিলো গিরিডিতে,
অদূরে শিলঙে!
আমার কোন্ পূর্বপুরুষ কবে নাকি চাল দেখেছিলো
বাংলার মাঠে
আমার কোন্ পূর্বপুরুষ কবে নাকি পবিত্র হাওয়া খেয়েছিলো
গঙ্গার তীরে।
হে আমার বাবা ঠাকুর্দা পূর্বপুরুষ, তোমাদের এই মাতাল ও
হিজড়ে পরপুরুষকে কিছু ঠিকানা যোগাড় করে দাও।
যথা—-

১নং ... ঝর্ণার কলকণ্ঠ কোথায় গেলে শুনতে পাব?

২নং ... চাল জন্মায় কোন্ দেশে?

৩নং ... কোন্ দেশে পাচার হলো পবিত্র হাওয়া?

রমেশ বাড়ুয্যের কবিতা প্রসঙ্গে

অ. অংশীদার রমেশ বাড়ুয্যে, তুমি এখন কোন্ বাইলেনে
অদৃশ্য রয়েছো এই ৬০ দশকের
অন্ধকার কারাগারে অন্তরীণ যখন আমি ও আমরা।
অকুতোভয় রমেশ বাড়ুয্যে তোমার সেই
অশ্লীল, অকথ্য শব্দাবলী, প্রেম নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি
অকস্মাৎ কোনোদিন মনে পড়ে আমিও বিমূঢ়। তোমারই

আ. আলোড়িত কবিতার দিন দৃশ্যপটে নিকোনো উঠোনের
আলোর মতো কখনো প্রোজ্জ্বল। সীতেশ, মৃণাল
আমরা যখন ১৮নং এই বাড়িটিতে শুয়ে আছি
স্মৃতির গন্ধে তোমার কবিতা, অমর কবিতা
আয়ত চোখের মতো চেয়ে আছে অবিরত
আমাদেরই মুখে আলোড়িত কবিতার দিন।

ই. ইদানিং তোমার কবিতাগুলি ভালোলাগে বলে
ইচ্ছে করে তোমারই পংক্তি ধরে হেঁটে যাই
ইতিহাসের পুরনো ভাঁড়ারে। শৈশবের দীর্ঘ সব
ইমারত ধ্বসে গেলে এখনো নিষ্ঠুর স্মৃতি, বিনষ্ট দেয়াল
ইতস্তত ছড়ানো কিছু অলৌকিক ধ্বনি। মনে হয়
ইউনানী ভাস্কর্য স্তরে স্তরে সজ্জিত এখনো।

ঈ. ইক্ষণে দেখেছি আমি বেলা যায় মেঘে মেঘে। আমারই
ইপ্সিতা যেন ব্যভিচারিনী। রমেশ বাড়ুয্যে তোমার কবিতায়
ঈষৎ পাপাচারে প্রেক্ষিত মনন, কবিতার
ঈশ্বরময় দুর্গন্ধ ভীষণ। তবুও কেন যে
ইষদুষ্ণ দুঃখের মতো ভালোলাগে তোমার কবিতা।
ঈর্ষা হয় রমেশ বাড়ুয্যে, বুকে জ্বলে আগুন আগুন।

উ. উচ্চকিত প্রহরেরা যন্ত্রণায় নিয়তই বিদ্ধ করে
উড়ন্ত হৃদয়। ইমারত ভেঙে যায় যাক্, দিকে দিকে
উজ্জ্বল সূর্যের দীপ্ত আলোক। কী জানি
উড়ো চিঠির মতো মিথ্যে নাকি সমস্ত বিকেল।
উপদ্রুত অন্য এক জীবনের গল্প, রমেশ বাড়ুয্যে!
উৎকণ্ঠিত চোখ তুলে বলে, পীযূষ আমার কবিতায় ব্যবহৃত
তোমারই বিমল বিশ্বাস কিংবা দিনগত পাপ।

সুধীনের মুখে

'না না। ওসব কিছুই নয়। কিন্তু কবিতায় লেখে শুয়োরের বাচ্চা।'
(সমীর মুখোপাধ্যায়)

যুগান্তরের কলমে একটি সংবাদঃ বেলেকাটা পড়ে জনৈক যুবকের মৃত্যু।
ওরা ছবি ছেপেছিল। আমার মনে হয়, সুধীন, এ ছবি তোরই
যেহেতু বেআব্রু মুখে অশ্লীল খিস্তি।
তোর নিত্যকার ব্যবহার্য সংলাপ অফিস, রেঁস্তোরা,
এমনকি বাড়িতেও।
সুধীন, তুই খুব ক্ষেপে গেছলি ইদানিং।
কমলার প্রত্যাখ্যানে কিছু মাত্র দুঃখ ছিলনা, বরং মুক্তির উল্লাস।
অন্বেষণে অন্য কোন মুখ অর্থাৎ
প্রতি অঙ্গে যৌবনের ক্ষুধার্ত কামনা।
সুধীন, কেন যে আমার দর্পণে বারংবার তোরই আটকুঁড়ে মুখ?
সুধীন, কেন যে আমারই মনের ঘরে তোরই দুর্বার পদধ্বনি
আশ্চর্য সোচ্চার?
সুধীন, তোর ছোটগল্পে সম্প্রতি খুব বেশি রক্তের ব্যবহার,
কবিতায় প্রেমের বিরুদ্ধে তীব্র জেহাদ; যেন সাত লক্ষ যুবকের মুখে
চটকদার খিস্তি।
সুধীন, তোর জীবনদর্শনে ক্রমশ জটিলতা, হতাশা অপ্রতিরোধ্য মৃত্যু।
আর আমি?
নেপথে ঃ হে ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করো। আমি বিস্ফোরক ক্রোধ ছাড়া
অন্য কিছু নয়।

দ্বিতীয় সত্তার প্রতি

এই অশ্লীল অন্ধকারে তোমাকে
দেখাই যায় না।
তুমি অস্পষ্ট।
তুমি নিয়তির মতো অদৃশ্য।
তুমি দুর্বোধ্য।
তুমি মৃত্যুর মতো এক প্রবল আতঙ্ক।
লণ্ঠনটা জ্বালাও।
দূর ছাই! আলোটা জোরালো নয়।
তোমাকে কেমন ম্লান দেখাচ্ছে।
তোমাকে বহু পুরোনো ফটোর মতো
পাঁশুটে দেখাচ্ছে।
তুমি অখুশি।
তুমি অসুখী।
তুমি নিরুত্তাপ।
বরং ৫০০ পাওয়ারের একটা বৈদ্যুতিক আলো জ্বালো।
দিনের মতো প্রখর আলো,
সূর্যের মতো তেজী।
তোমাকে আমি দেখবোই।

লৌকিক আশ্রয়

আমার তুচ্ছ স্বপ্নগুলি আমাকে
সর্বক্ষণ পেয়ে বসে। এই ধরুন বাড়ি ফেরবার মুখে
      এখন এই রাত বারোটায়, মনে পড়ে
সাদা শ্বেতপাথরের মতো সেই ইস্কুলবাড়ি,
আমার সমস্ত দুপুরের চিন্তাভাবনা দূর হলে
শহরের উপকণ্ঠে সূর্যাস্ত সময়ের শীতল কোনো
      মন্দাক্রান্তা মাঠ,
অনূর্দ্ধ তিরিশের কোনো কোনো যুবতীর অনুষ্টুপ মুখ।
আমার চোখের উপর শেষ ট্রাম এখনো অনেক দূর।
স্টপেজের নরম আলোর নীচে দাঁড়িয়ে থেকে
      জীবন-তীর্থ দেখি চৌবঙ্গীর বুকে।
ঠিক ঐ সময় জীবনানন্দের মতো চলে যেতে ইচ্ছে করে
কোনো এক 'ধানসিঁড়ি নদীটির ধারে'।

তারপর বিকট জন্তুর মতো তিনচক্ষু ট্রাম
                              এসপ্লানেডে ঢোকে।

মনে মনে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলি—সেই প্রকাণ্ড ছায়াবৃত
তেরোতলা বাড়িটি দূরে থাক। বাচ্চাকে বুকে টেনে,
আর্তনাদ বুকে চেপে কিংবা শরৎ বৃষ্টির মতো
কেঁদে কেঁদে এখন শুয়ে পড়ুক একান্ত বিশ্বাস্য আশ্রয়
                              তার প্রিয় বিছানায়।
বেহেড মাতাল হয়ে ফিরে এসে যেন তাকে না দেখি
বসে আছে—হাঁটুর উপর তন্দ্রাবিজড়িত
                              কষ্টক্লান্ত মুখ।
গাড়িবারান্দায় জায়গা প্রচুর। এই কলকাতার অনেক
নিরাশ্রয় লোক নির্ভয়ে ঘুমুতে পারে।
হে আমার বিশ্বস্ত বন্ধু অর্জুন সিং, তোমাকে কাল
                              সিনেমার পয়সা দেবো,
একটু আশ্রয় দাও। রাত্রি তো শেষ হয়ে এলো।

তোমার আসন

সময়ে।
অসময়ে
আমার চলে যেতে ইচ্ছে করে গোপন দুঃখের
রাতে।
তোমার যে আসন পাতা আছে বুকের ভিতর
রৌদ্র
হাততালি দ্যায়
চপল
শিশুর মতো,
মেঘ ডানা মেলে উড়ে যায় শূন্যে।
সময়ে
অসময়ে
প্রবল বৃষ্টির দিনে
ভিজে ভিজে ছুটে আসতে ইচ্ছে করে তোমার
যে আসন নিভাঁজ পাতা আছে বুকের উঠোনে
তার
এমন দারুণ শক্তি
কৌশলে পলক ফেলতে না ফেলতেই ফিরিয়ে দ্যায়
পুরোনো নগর।

অবসন্ন গির্জা আমার ব্যবসায়

শহরের সমস্ত গির্জাগুলি এক অবসন্ন অন্ধকারে
ডুবতে ডুবতে একসময় উপাসনার সময় হলে মহাশয়,
একজনও মানুষ এলোনা।
রাস্তার সুদীর্ঘ মিছিলে আমারই মতো বিপন্ন মুখ। সম্ভবত কেউই
জানেনা তারা বিপন্ন কেন। কেউ ভুলেও ভাবলো না আজ রোববার,
উপাসনার দিন।
উপাসনার অন্তিম মুহূর্ত নিকটে এসে আনত মুখে ফিরে গেলে
রাত বারোটার ঘণ্টাধ্বনি শব্দিত হতেই ঘোষিত হলো পরমায়ু থেকে
অবলুপ্ত অন্য একটি দিন।
যীশু, বৃথাই তুমি অস্তিত্ব নিয়ে এখনো বেঁচে আছো;
তোমার কবরে কোনোদিনই আমি প্রদীপ দেবোনা। মহাশয়, শোনো,
ইদানিং আমার কিছু মাটির প্রয়োজন এবং মদের ব্যবসায়ের জন্য
এই অঞ্চলটা সত্যিই দামী।
মহাশয়, তুমি অস্তিত্বহীন জানি বলেই দিনযাপনে আমার সুখ নেই।
মৃত্যুতে আমার দুঃখ নেই। তোমার গুণাবলীতে প্রতীতি নেই বলেই
আমি তোর শেষতম পুরুষ—চোখে যার অত্যুগ্র
লোভ, আর আগুন। রক্তপাতে তীব্র অনুরাগ।
মদের ব্যবসাটা এবার আমি চালু করবোই এবং মহাশয়,
তোমারই কবরের উপর আমার প্রলুব্ধ জীবনের মূল।
কেন?
দীর্ঘ অন্ধকারে অস্তিত্ব হারাতে হারাতে ক্রমশ বিপন্ন শহরের
সমস্ত গির্জাগুলি। আজ উপাসনার পরম মুহূর্তে প্রত্যেকটি মুখে
অবসাদ, ক্লান্তি, দুঃখ, অবিশ্বাস।
রক্তহীন এই নিস্তেজ শরীরে বলিষ্ঠ আয়ুর জন্য আশু প্রয়োজন
আমারই দোকানের কান্ট্রি-মেড মদ!

স্বপ্ন মানেই উৎকৃষ্ট গাঁজা

'স্বপ্ন মানেই উৎকৃষ্ট গাঁজা বলে আমার ধারণা'
(সমরেশ বসু ঃ 'বিবর')

আমি প্রায়শই স্বপ্ন দেখি এক ভয়ংকর মৃত্যুর।
একটা সাংঘাতিক দুর্ঘটনায় আমার যাবতীয়
মানসিক সম্পদ গৌরব অন্তর্হিত হলো।
জনারণ্যে থেকেও নিঃসঙ্গ নায়কের মতো দুঃখকাতর মুখে
পথের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পায়চারি করতে করতে
হঠাৎ চোখের সামনে তেড়ে এলো এক
ভয়ংকর দ্বিপদ জন্তু।

তার মুখে আমার বেডরুমে টাঙানো
প্রপিতামহের মুখ যেন হুবহু খোদিত। অন্যত্র
ডাকপিওনের হাতে বারবাটীর প্রথম পুরস্কার
১লক্ষ ৩০হাজার টাকা। একবারও অথচ
মনে হলো না ১০০টাকা দামের চালে অরুচি ভীষণ।
আর প্রায়শই ভুলে যাই আমার রাত্রেও ভাত খাওয়া
নিতান্ত দরকার।

বিভ্রম বিষয়ক কবিতাগুচ্ছ

এক.

বিবেকানন্দ ব্রীজ পেরোবার আগেই
স্টেশন নেই স্টেশন মনে করে গতি কমে কমে
ঘণ্টায় পাঁচ কিলোমিটার মাত্র।
　　　　　　　　　　মধ্যদিনের
প্যাসেঞ্জার ট্রেন এই থামলো বলে
　　　　　　　　　　এই থামলো বলে।

দুই.

ফোনে হাত রাখতেই সতেরো বছরের দুরন্ত কিশোরী
ভুলে গেল ফোন করবে কাকে। অথচ কে যেন
এতো করে বলে দিয়েছিল—'এই রইল আমার
ফোন নাম্বার; যখন ইচ্ছে ডেকো।
　　　　　　　　　　যখন ইচ্ছে ডেকো।'

বন্দীদিনের জন্য

(১)

বন্দীদিনেব জন্য অদ্ভুত মমতা। নাকি, স্বপ্নে কোনোদিন
পদশব্দ ছিল সিদ্ধার্থপুরুষেব।

(২)

মনেব ভিতব ভূমিষ্ঠ শিশু
বালিশেব ওয়াড়ের উপব উঠে বসে দুবন্তপনায ধ্বংস কবছে
মধ্যপথেব লাল আলো, লক্ষ জানালা।

(৩)

কোনোদিন কি বন্ধুদেব ছবিগুলি
শিযবের দেযালে বেখে খুশিতে মগ্ন হব?
লণ্ঠনে দীর্ঘাযু আলোক?

(৪)

কিছুকালের জন্য
টর্চের গ্রাসে প্রকাণ্ড এক কালো দাগ ছিল।
এইবার বদলাবো নিশ্চয।

গভীর ঘুমের রাজ্যে

অসময়ে ঘরের ভিতর যথার্থ আমাকে দেখি নির্বাক ফেরিওয়ালার মতো
রংদার চুড়ি, সুগন্ধী সাবার ইতস্তত ছড়ানো আমার মুখের উপর
কালো পর্দা। তারপর আরেকটা।
          তারপর আরেকটা। তারপর।
তারপর এক অন্ধকার গুহা। আমার অকৃতজ্ঞ স্ত্রী বললে, এদিকে
নোতুন এক শহর। ব্যবসায় ভালো হবে। ওদিকে বাতাসে উড়ছে নোট।
সেই থেকে গড়া চাচা নেহেরুরর মাথা আঁকা টাকা, আধুলি।

ওদিকে স্বপ্ন
          ওদিকে জীবন
                    ওদিকে আমি
                              ওদিকে তুমি
                                        ওদিকে আমাদের
তৃতীয় অস্তিত্ব।

গুহার ভিতরে পা ফেলতে হঠাৎ ছল্‌কে উঠলো আমার একমাত্র
নিজস্ব সম্পদ তাজা রক্তাক্ত হৃদপিণ্ড। এবং
তীব্র জলোচ্ছ্বাসের শব্দ ·
          পাহাড় ভেঙে গড়িয়ে পড়ার শব্দ
                    আগুন লেগে ধ্বংস হবার শব্দ
                              চতুর্দিকে এইসব
অবাঞ্ছিত শব্দের ভিড় শব্দের মেলার মধ্যে লাটিমের মতো
আমার মাথা বন্‌বন্‌ ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে একসময়
অসহ্য অবসাদ এলে কিছুই মনে নেই ... ... প্রচণ্ড ক্লান্তি ... ...
তারপর গভীর ঘুমের রাজ্যে আমি এক যুবরাজ কোনো ভিন্‌দেশী
রাজকুমারীর শয়নকক্ষে নিজেকে
          ভিন্‌দেশী রাজকুমারের মতো দেখলাম।

কঠিনতম অঙ্কে মনোযোগ

কিছুই ঠিক ছিল না—
তিরিশের পূর্বেই বিবাহ, অথবা কঠিনতম অঙ্কে মনোযোগ, অথবা
সি.আই.ডি ৯০৯-এর মতো অবিশ্বাস্য বীরত্ব এবং
প্রণয়।
অথচ বোয়িং এয়ারক্র্যাফটের ল্যাণ্ডিং দেখতে আশ্চর্য
কৌতূহল থাকবার কথা ছিল অথবা বিশেষ প্রিয়জনের
মৃত্যুর স্বপ্ন দেখে দুঃখে কেঁদে ওঠা মধ্যরাত্রে
অন্ধকারে,
গভীরতর অন্ধকারে—
নিস্তেজ স্নায়ুর মধ্যে সানাই বেজে উঠুক—এটাই
উচিত ছিল। কথা ছিল
উচিত-অনুচিত নিয়ে
নিত্যানন্দর কেবিনে মাইকেল প্রসঙ্গে অদ্ভুত তৎপরতা
এবং গভীর অন্বেষায়
পরিচিত বৃত্তের বাইরে
স্বাধীন রক্তের আন্দোলন জমে উঠলে
অনেক উত্তপ্ত থাকবো, আর,
'দ্যাখো দ্যাখো, কলকাত্তাকা রেল দ্যাখো'—বলতে বলতে
যাযাবর খেলুড়ে যাদুকর তার রণ-পা নিয়ে
মধ্যশহরেই দাঁড়িয়ে পড়লে
আমরা প্রত্যেকেই দুর্দান্ত কিশোর হয়ে উঠবো—
যাদের বয়স
কোনোক্রমেই কুড়ির উপরে না। অথচ
আকস্মিক খেয়ালে—
তিরিশের পূর্বেই বিবাহ, অথবা কঠিনতম অঙ্কে
গভীরতর মনোযোগ।
কারণ এই এপ্রিলেই আমরা সন্ন্যাসী হয়ে যাবো,
নাকি দুঃসাহসী অভিযাত্রী
ভূমধ্যসাগরে হাজার হাজার ঢেউয়ে আন্দোলিত
কাঠের জাহাজ।
কি জানি, কিছুই ঠিক ছিলনা, কিছুই ঠিকঠাক ছিলনা।

এমন একটা সংবাদ

এ এমন একটা সংবাদ নয় যে, রেডিওর নব ঘোরালেই
ঘোষিত হবে—আকাশবাণী, খবর পড়ছি . .
আজকের বিশেষ বিশেষ খবর হলো . ...।

এ এমন একটা খবর, ঐ ওদের মতে, এটা এমন একটা
খবর যে, শুনতে শুনতে কখন ঘুম পেয়ে যায়।
অথচ

কে জানে এই খবরই একদিন
আমার শোবার ঘরের শার্সি ভেঙে ঝনঝন্ শব্দে
বেজে উঠবে।
জানালার গরাদ ভেঙে কালো কঠিন লোমশ হাত, আমার
পোষা কুকুর শিকল ভেঙে সহসাই বিদ্রোহী হয়ে উঠবে।
রেডিওতে বাংলা হিন্দি কোনো গানই বেজে উঠবে না। শুধু
গুলির শব্দ, প্রতিবেশীদের তৎপর আচরণে,
বিদ্রোহীদের গুপ্ত আক্রমণে ভেঙে পড়বে
রেডিওর ডায়েল লাইট। আর
এক ঘন অন্ধকারে—
আমি ও আমার স্ত্রী
মুখোমুখি বসে থেকে শুধুই ভাবতে থাকবো—
কখন যে মোরগ ডাকবে, আলোর নিশান হাতে ছুটে আসবে
লক্ষ লক্ষ মানুষ, মানুষের মিছিল।

দেবতার রক্তে কল্লোলিত শিহরণ

এক-একটি রক্তাক্ত দিবসে মুমূর্ষু মায়ের গাঢ় লাল
শাড়ির আঁচলে
লবনাক্ত ঘাম মুছে আশ্চর্য তৃপ্তির কণ্ঠে ঢেকুর তুলব—
—আঃ বাঁচালে ঈশ্বর!
কারণ সেই শেষ কবে পিরামিডের ভিতর
প্রপিতামহ দেখেছিলেন
উজ্জ্বল ইতিহাস ঃ উন্নত নাসিকা, নীলরক্ত
আর্যের অমিতবিক্রম।

আর আজ
রঙিন তাসের সাহেব
স্বপ্নশীর্ষ থেকে সশব্দ পতনে আর্ত চীৎকার দিলে
ঔরংজেব—লালরক্ত তলোয়ার—ঝলসানো কামিজ
মৃত্যুর সংবাদসহ
সহাস্যে জ্বলে ওঠে
আবির্ভূত লক্ষাধিক সাগর-সন্তান।

অথবা
টক্‌টকে রৌদ্রের তাপে
ঘণ্টার লক্ষ অযুত মাইল
প্রচণ্ড গতিবেগ—অ্যাপোলো, জেমিনি দ্যাখো,
ছুটে যায়
লক্ষ্য স্থির দেবতার রক্তের মধ্যে
কল্লোলিত শিহরণ
অন্য এক স্বর্গ নাকি
অন্য এক সমুদ্র বন্দর—গাঢ় লাল রক্তের
হাজার প্রহর।

স্বপ্নে ফয়া ফুঙ্গিদের দেশে

কাল ৯ জানুয়ারির মধ্য রজনীতে
আমি
এই আমি পীযূষ রাউত কি সীমান্ত পেরিয়ে
অন্য কোথাও
অন্য কোনও স্বাধীন রাষ্ট্রে
বেড়াতে গিয়েছিলুম?
হ্যাঁ। গিয়েছিলুম তো। জলজ্যান্ত। সশরীর।
গিয়েছিলুম আমার বাবার পবিত্র জন্মভূমি
প্রাচীন বর্মামুলুকের মান্দালয়ে।
পাহাড়-অধ্যুষিত এক উপত্যকায় সেদিন ছিল
বার্মিজদের এক জাতীয় উৎসব।
মান্দালয় আমার দাদু ডাক্তার বৈকুণ্ঠনাথের
কর্মভূমি।
উৎসবের ভিড়ে তাঁকে কিন্তু একটিবারের জন্যও
দেখলুম না। দেখলাম না তার শিশুপুত্র
আমার বাবাকেও।
হোস্ট বার্মিজ বন্ধুদের আপ্যায়নে
খামতি ছিল না কণামাত্র। বিরতিপর্বে নাকি
অনুষ্ঠান শেষে ওরা আমাকে সাদরে নিয়ে গেল
দাদুর সরকারী কোয়ার্টারে।
সেই পরিত্যক্ত শুনশান কোয়ার্টারে
জনমনুষ্য কেউ ছিল না।
এবং কীভাবে যে রাত শেষ হবার আগেই
ফিরে এলুম স্বদেশে
আমাদের প্রেমতলার ফ্ল্যাটে।

কাক কালো

যে বসে আছে একা,
মনখারাপ, অকালের আকাশেও কাককালো মেঘ;
তাকে স্বস্তি দিতে, অন্তত কিছুক্ষণের জন্য, কেউ আসেনি। কেউ আসবেও না।
তার বয়স কিন্তু সাত বছর আগেই তিরিশের সীমান্তরেখা
পেরিয়ে গেছে।
পড়াশোনায়, সেই ছাত্রবেলায়, মোটের উপর মন্দ ছিল না; তারও একটা
সীমারেখা আছে' সেটাও আজ দূরের অতীত।
ওরা কেন যে বি.এ এম.এ পাশ করে!—বলেছিল বুড়ো কৃষক ইয়াকুব।
সে বসে বসে ভাবে—ইয়াকুব সত্যি কথাই বলেছে।
কাল সকাল দশটায় তার একজীবনের শেষ ইন্টারভ্যু।
কী যে সব প্রশ্ন করবে—ভেবে ভেবে ঘুম হয়নি সারারাত।
তাছাড়া এমনও তো হতে পারে ওটা একটা লোকদেখানো প্রহসন।
যে বসে আছে একা,
মনখারাপ, সে ভাবে—গোটা জীবনটাই হয়ে গেল
বিতিকিচ্ছিরি প্রহসন।

আমার জং ধরা কথা

আর কত বছর
ঘুরে ফিরে   হয়তো সকালে
                   হয়তো রাত্রে
                   হয়তো এই পোড়া শহরে
                   হয়তো নান্দনিক অন্য কোনও শহরে
আত্মীয়কেন্দ্রিক কোনও ঘরোয়া আড্ডায়
বাহিরের কোনও সাংস্কৃতিক আড্ডায়
আর কত একঘেয়ে নিজের কথা, জং-ধরা কথা
                                        অবিরল বলবে?
শ্রোতারা বিরক্ত হবে। হাই তুলবে। মনে মনে
বলবে—ঐ শুরু হল বলে—জঘন্য!

বরং হে মূর্খ
এখন থেকে নির্বাক শ্রোতা হও।
মুখে হাসি, সহানুভূতির মুখাবয়ব,
                                        শোনো অন্যদের কথা।
শোনো বিচিত্র সব কথা, তাহাদের কথা,
যা এতকাল অশ্রুত ছিল।

আমার ফ্ল্যাট

অন্য এক শহরে
আমাব একটা ফ্ল্যাট আছে। সেই শহরে,
আমার ছেলেবেলার শহরে,
কিনে ফেলে রাখা সেই শূন্য ফ্ল্যাটে, বহুদিন পর,
আবার যাব। থাকবও বেশ কিছুদিন। সম্ভব হলে আমৃত্যু।
গিয়ে হয়তো দেখব অনেককিছুই বদলে গেছে। হয়তো
দেখব অনেককিছুই বদলে যায়নি। বরং
হতশ্রী হয়েছে আবও।
হয়তো দেখব ইংরেজি নামের ঐ ফ্ল্যাটবাড়িটি
পোশাক না-বদলে একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কাজ শেষ না হওয়া
গ্রাউণ্ড ফ্লোরের গা ঘেঁষে তৈরি হয়েছে হাজারটা ডাস্টবিন।
বদলে যাওযার অঢেল সম্ভাবনা থাকলেও
দেখব কিছুই ঘটেনি।
ফ্ল্যাট।
কোনও কোনও প্রমোটার স্বপ্নের ফেরিওয়ালা। ক্রেতাকে
আকর্ষণ করতে নীল নকশা মেলে ধরে
স্বপ্নের সিরিজ দেখায়।
আট ন'বছরের আগে—
আবেগ-বিহ্বল, নাকি অভিনয়তাড়িত যুবক প্রমোটার
বলেছিলেন—পাঁচ বছর পর এই ডোবা সন্নিহিত বিতিকিচ্ছিরি জায়গাটিকে
চিনবেনই না।
আবেগবিহ্বল মূর্খ আমি সেই স্বপ্নকে ফেভিকল দিয়ে
এঁটে রেখেছিলুম।
পাঁচ বছর সেই কবেই শেষ হয়ে গেছে। হয়নি কিছুই।
এখন ভরা শ্রাবণ
গিয়ে হয়তো দেখব আমার বেডরুম হয়ে গেছে
একটা আস্ত পুকুর।

ভাঙো

ভাঙো!
ভেঙে ফেলো এই বালখিল্য উচ্ছ্বাস।
ভেঙে ফেলো গ্রামাব শাসনের পালকখসানো
সকল বিশেষ্য-বিশেষণ।
প্রতিক্রিয়া?
তোমাকে প্রাণদণ্ড না হোক, না হোক যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
অন্তত বেশ কয়েক বছর শব্দ-বাক্যে
জেরবার করে তুলতে পারে।
যেতে যেতে তবু
হুঙ্কার দেব—ভাঙো!
ভেঙে ফেলো জং ধরা ভঙ্গুর পুতুল। ভেঙে ফেলো
ধৃতিকুর্তার অপরূপ মোমমূর্তি তার।

বৃষ্টি

কাল রাতে
মৃত্যুর মতো প্রশান্ত ঘুমে, তখন আকাশ ভেঙে
খুব বৃষ্টি হয়েছিল?
নাকি শুধু বৃষ্টি নয়, তুমুল ঝড়বৃষ্টি?
তা বৃষ্টি বলো, বিশেষণযুক্ত বৃষ্টি বলো, প্রয়োজনীয়তা
যতই থাকুক, আমার ভাললাগার তালিকায় সে কিন্তু নেই।
তার সঙ্গে সম্পর্ক আমার অহিনকুল।
যতদূর মনে পড়ে আমার কোনও দুর্ঘটনাব হেতু, সে তো
কোন দিনও ছিল না। তবে কি অলৌকিক দুর্ঘটনা কোনও?
জন্মান্তরের প্রতিক্রিয়া?
বৃষ্টিও তো হত্যালীলা সংঘটিত করে। চোখ
না দেখলেও মিডিয়া দেখায়।
হতে পারে পূর্বজন্মে আমার অপঘাতমৃত্যুর হেতু
ঘাতক বৃষ্টি।
বৃষ্টি নামের এই বিশেষ শব্দটার মাধুর্য ও সৌন্দর্য কিন্তু
আমাকে স্তব্ধ করে বারবার;
তবু সে যেন এই জন্মের, জন্ম-জন্মান্তরের
অসহনীয় শত্রু আমার।

এষা

কালাদা'র আসাম-টাইপ দোতলাবাড়ির
রেলিংঘেরা সরু বারান্দায় এষা তোমার সঙ্গে
প্রথম পরিচয়। শুধুই কি প্রথম? শেষপরিচয়ও বটে।
কো-এডুকেশন কলেজে
যে যুগে মেয়েরা স্যারের অভয় ছায়ার সঙ্গে
মিলেমিশে
ক্লাসরুমে ঢুকে এবং পিরিয়ড শেষে আবারও
স্যারের ছায়া-অনুগামিনী
কোনো কোনো সহপাঠীর বুকে হাহাকার তুলে
লক্ষ্মণ-গণ্ডীর ভিতরে ফিরে যায়
চলে যায়—ঠিক ঐ যুগে এষা তুমি সেই
মেঘ-মেঘ রাত্রিব ক্ষণস্থায়ী আকস্মিক আলো,
যাকে দেখামাত্রই
পৃথিবীব সব অসুখ সেরে যায়। এষা তুমি অবিকল
ঐরকম।
পঞ্চাশ বছর পরেও
মনে হয় কাল সন্ধেবেলা কালাদা'র দোতলাবাড়ির
রেলিংঘেরা বারান্দায় এষা তুমি একগুচ্ছ রজনীগন্ধা।
আজ ভোর ভোরবেলা
এয়ারপোর্ট কুন্তীরগ্রাম হয়ে মেঘ ও রৌদ্র ছুঁয়ে ছুঁয়ে
এষা সেই যে তুমি আকাশপথে ...
আর কোনোদিনই তোমার সঙ্গে দেখা হল না।
কালাদা'র বাড়িতে কারোর মুখে একটিবারের জন্যও
তোমার নামও উচ্চারিত হল না।
তবু মনে হয় এষা তুমি আজও আছ
নির্মীয়মান ফ্ল্যাটবাড়ির নীচে
কালাদা'র অদৃশ্য আসামটাইপ বাড়ির দোতলার রেলিংঘেরা
বারান্দার সন্ধ্যায় কী দারুণ উজ্জ্বল! কী দারুণ উজ্জ্বল
তুমি এষা!

একটি অদ্ভুত স্বপ্ন

বাহিরটা দেখিনি।
সময় তো আমার, জি-হুজুর গৃহভৃত্য কখনোই নয়। দেখলুম
শিল্পী রাজমিস্ত্রীর হাতে গড়া একাধিক খিলানের রম্য প্রস্তাব
একটা বিশাল সজ্জিত হলঘর। দেখলুম
সভামঞ্চ আলোয় আলোয় ভরে দিয়ে বসে আছেন
দুগ্ধফেণনিভ শ্মশ্রুময় রবীন্দ্রনাথ। হ্যাঁ, সত্যি সত্যি রবীন্দ্রনাথ।
হলভর্তি ধুতি পাঞ্জাবী পরা মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতা নির্বাক, নিস্পন্দ, নিথর।
দেখলুম আমার কেতাদূরস্ত বাবা সবকিছু ঠিকঠাক চলছে কিনা
তদারকের স্মার্ট ভূমিকায়।
বাড়িটা নিঃসন্দেহে জমিদার-বাড়ি।
আর আমি? আমি এই জমিদার পরিবারেরই এক অদৃশ্য দর্শক।

'দেশ' পত্রিকার এই সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছে শিল্পী রবীন্দ্রনাথের আঁকা
দুর্ধর্ষ সব রঙীন পোর্ট্রেট।
কৌতূহল-ভালোলাগায় মত্ত আমি
পাতা ওলটাতে ওলটাতে বিস্ময় বিমূঢ় দেখলুম
একটা গোটা পাতা জুড়ে আমার বাবার একটা অসাধারণ ছবি।
অঙ্কনশিল্পী, বলাবাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
পাগল আমি একে ওকে ডেকে ডেকে বলতে লাগলুম-
দ্যাখো দ্যাখো, তোমরা সবাই দ্যাখো—রবীন্দ্রনাথের আঁকা
বাবার এই ছবিটা।

সময়, ভগ্নদূত সময়, আমার সেই পাগল উচ্ছ্বাসকে নিমেষের মধ্যেই
স্বপ্ন করে তুলল। তুলল তো বটে। কিন্তু
সেই সন্ধিমুহূর্তে, বাসি পোশাকের মতো
আমার পিতৃদত্ত এই অন্তর থেকে একে একে
খসে পড়তে লাগল রাগ, দুঃখ, অভিমান এবং দুর্ভাবনা।

মূর্তি—মর্মর মূর্তি

যেন মর্মর মূর্তি—-
মূর্তি ?
অতএব নিষ্প্রাণ। সমালোচক হয়ে তাকে
শিল্প বলতে পারি।
মানুষ নয়।
দিক্‌বিদিকে হন্যে হয়ে খুঁজে
মানুষ না পেয়ে
মূর্তিকেই ভেবেছি মানুষ।
সে তো হাসেনা। কাঁদেনা। কথাও বলেনা।
আমার এই ভাবনার কথা
যখন ব্যক্ত করলুম, তেড়ে এলো কথা।
ভুল ভাবনা ?
আমার এই ভুল ভাবনার জন্য
খেসারৎ দিতে গিয়ে হারিয়েছি
মানুষের প্রেম
অবশ্যই ভুল মানুষের।
মানুষ—ক্রমে এই অক্ষরের শব্দের
কোনো ব্যঞ্জনাই
শেষপর্যন্ত আমার কাছে রইল না বলেই
আমি, একজন মানুষ, অবশেষে হয়ে গেলুম
মূর্তি—মর্মর মূর্তি।

একজন স্রষ্টার

আমারই ছায়া প্রচ্ছায়ার অত্যুগ্র ক্রোধ, অনুমান করি,
হঠাৎই একদিন সর্বভূক অগ্নি, অনুমান করি, গিলে খাবে
আমারই নিঃসঙ্গ অনুভব, অনুভব যে কি না উদ্বেল হতে
জানে না, জানে শুধু
সারাৎসার নির্জনের ভাষা। জানে শুধু চোখকে ফাঁকি দিয়ে
নিঃশব্দ ক্রন্দন।
দেহ নয়। দেহ তো অশ্রুজলে আর্দ্র প্রত্যক্ষ অগ্নির, যন্ত্রণার
অবশ্য প্রাপ্য অধিকার।
একজন স্রষ্টার, একজন সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক ত্রুটি
সে তো নিরবচ্ছিন্ন আছেই।
একজন স্রষ্টার, একজন নমনীয় মানুষের অজানিত পাপ,
যদি কিছু থেকে থাকে, তার মাশুল চক্রবৃদ্ধি হাবে
গুণতে গুণতে
বুকের গভীরে, তারও গভীরে গুল্মলতার অদৃশ্য বন্ধন
একদিন ছিন্ন হয়ে যাবে।

কিনে নেব

ভাবছি
রোজ রোজ লাগামছাড়া দামে
মাছ না কিনে
গোটা একটা নদীই না হয় কিনে নেব।

যে শহরে আছি
প্রাগৈতিহাসিক এই শহরে পাকা সড়ক কোথায়?
পায়ে হেঁটে, রিকশো অটোতে, এমনকি সাইকেল-বাইক-স্কুটারে চেপে
প্রয়োজন তাড়নায় যাতায়াত সাক্ষাৎ একেকটি বিপজ্জনক অভিযান।
অতএব, বাঘিনীকে থ্যাংকস্ জানিয়ে সিঙ্গুরের আঁতুড়ঘরটাই না হয়
কিনে নিই।
টাটা হয়তো সস্তাদামেই ছেড়ে দেবে। ন্যানো না হোক, বাঘিনীর মুখে
হরিণছানা তুলে দিয়ে ছোট চারচক্রযান নিজেই বানিয়ে নেব।

লাইনে দাঁড়িয়ে গরমে ঘামের উৎকট গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে
ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলা ঝক্কির ব্যাপার।
বরং কিনে নেব গোটা ব্যাঙ্কটাই।
লোডশেডিং-এর উত্তরোত্তর বেড়ে চলা অত্যাচার
কাঁহাতক আর সহ্য হয়! বরং কিনে নিই একটা বিদ্যুৎপ্রকল্প।
কিনব তো। টাকা কোথায়?
লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। গোটা টাকশালই কিনে নেব। নতুবা কোনো
যাদুমন্ত্রে হয়ে যাব লক্ষ্মী মিত্তল।

রক্তক্ষয়

যে সোফায় উপবিষ্ট আছো, তার খুব কাছেই
সেলফ্ ভর্তি শ'দুয়েক পুস্তক।
দুই ফর্মা থেকে কুড়ি ফর্মার গদ্য-পদ্যের বই একবারও
অনুযোগ করে বলে না—অন্তত কিছুক্ষণের জন্য
আমাদের মধ্যে যেকোনো একজনকে
এই শোভন কারাগার থেকে মুক্ত কর।
বলুক চাই না বলুক
ওদের মিনতি শোনার বাসনা তোমার এতটুকু নেই। অন্তরে
তোমার যে ধিকিধিকি জ্বলছে আগুন।
নির্ঘুম বরং শুয়ে থাকো ডিভানে, নয়তো সোফায় বসে থেকে
গ্রিল ছুঁয়ে খণ্ডিত আকাশ দেখো। দেখো হঠাৎ উড়ে যাওয়া দু-একটি কাক।
সোফা-সম্মুখে অনড় সেন্টার টেবিল পড়ে আছে
দিন-তিনেকের ছ'-ছ'টি বাসি কাগজ। ডাকে আসা কয়েকটি
লিটল্ ম্যাগাজিন।
ওরা হয়তো মনে মনে অভিমান করে বলে—
অপরাধ কী করেছি বলো ?
তুমি একটা বাক্যও উচ্চারণ করবে না। সেন্টার টেবিলের
গ্রাউণ্ড ফ্লোরে অপেক্ষাকাতর এক দিস্তে সাদা কাগজ,
কয়েকটা ডট পেন।
ওদের কে বলবে—যে যে অবস্থায় আছো, আমাকে
ডিস্টার্ব করো না।
এত ভয় কিসের ?
তুমি পড়বেও না। লেখবেও না। এক অপার্থিব রহস্য হয়ে
যতদিন পারো
রক্তক্ষয় করে যাবে।

যাযাবর পীযূষ রাউত

তাহলে পীযূষ রাউত তিনমাস একবছর অন্তর অন্তর
তুমি পিনকোড বদলাচ্ছ। বদলাচ্ছ মোবাইল-সিমও।
এটা অবশ্য তোমার বহুবছরের শখ। এটা তোমার
রক্তবাহিত অভ্যাস। গৃহস্থের চোখে
বদ অভ্যাস। হতে পারে এটা তোমার ভবিতব্য
রেলভ্রমণে যেতে যেতে স্টেশনচত্বরে ইরাণীদের সংসার—
বাহ্, ওরা তো বেশ আছে! আজ এখানে তো কাল ওখানে।
এই যাযাবর খেলায় সুখ না মিলুক, কিছু একটা তো
মিলতেই পারে। আর কিছু না হোক
বৈচিত্র্য তো রয়েইছে।
সুখ তো তোর চির-অধরা। পাখির মতো
পালিয়ে বেড়ায় গাছ থেকে গাছে। বন থেকে বনে
আর সোয়াস্তি?
সে যে কোলে ওঠা আদরের বেড়ালছানা। যতক্ষণ
কোলের ওম ঘুম যতক্ষণ, ততক্ষণই আছে।

অভ্যাসটা খুবই বাজে

অভ্যাসটা খুবই বাজে।
দেখেশুনে, অর্থাৎ বাছবিচাব না কবেই সবজিওযালাকে
বললুম—দাও দিকিনি এক কিলো আলু, আব একটা ফুলকপি।
কাঁচালঙ্কা-আদাও দিযে দাও শ'দুযেক।
লোকটা, মানে সব্জিওযালা কত ওজনেব পাথব তুলল
তা না দেখেই
হিসেবপত্তব না কবে
বাড়ি ফিবে হস্তান্তব কবতেই বোঝা গেল আদ্ধেক আলুই পচা,
ফুলকপিতেও অনিবার্য পচন।
অভ্যাসটা খুবই বাজে।
গোপন বাখি সব কথাই। সে ভালো হোক, চাই মন্দ, সবই।
এমনকি অসুখের কথাও।
এই যে সেদিন ছোটখাটো একটা বাইক দুর্ঘটনাও
ঘটে গেল, তা'ও।
তবে সত্য শেষাবধি গোপন থাকে না। ধবা পড়ে যাই।
এইবার ঠেলা সামলাও হে।
অভ্যাসটা খুবই বাজে।
স্বপ্ন দেখা স্বাস্থ্যেব পক্ষে খুবই ভালো। কিন্তু স্বপ্ন দেখতে
একদম ইচ্ছে করে না।
অভ্যাসটা আসলে খুবই বাজে।

এই বৃষ্টি

এই বৃষ্টি।
অকালের বৃষ্টি।
বৃষ্টির ভিতর হেঁটে যাচ্ছে ইস্টম্যান-কালার অগুনতি ছাতা।
এই রাত্রি।
ঘনঘোর রাত্রি।
বৃষ্টির উৎস
মেঘ ভেঙে একটুকরো মনখারাপ চাঁদ।
চাঁদ আজকাল কেউ দেখে না। সময় কোথায়?
বদলে গেছে সুখ ও শখের চেহারা।
পুকুরে উপচে ওঠা জল থেকে
পাড়ে ওঠা কইমাছের ঝাঁক। কেউ দেখে না। কেউ শোনে না
ব্যাঙের কোরাস।
বৃষ্টি।
বৃষ্টি হবে আরও। সারারাত বৃষ্টি।
আমার খোলা চোখে বৃষ্টি।
এই সময়
অপূর্ণতা হানে গোপন আঘাত।
বৃষ্টি আর অশ্রু এক হয়ে গেলে কে বলবে অকালবৃষ্টির
এইদিনে দুঃখ তোর কতটা গভীর!

প্রেমালাপ

বাইক-আরোহী কে এই সদ্য গোঁফ ওঠা সুবেশ যুবক
টেলিফোন বুথ থেকে
নীচু স্বরে এতক্ষণ কথা বলছে?
প্রায় প্রতিদিনই পাঁচ সাতবার মোবাইল এবং ল্যাণ্ডফোনে
কোনো তাড়া নেই—এমন ভঙ্গিতে কাকে ফোন করে?
কী এত জরুরী কথা তাহার? তাও প্রতিদিন?
টেলিফোনের অপরপ্রান্তে যে রয়েছে, সে নিশ্চিত কোনো
রূপসী তরুণী।
বাড়িতে তার অবাধ স্বাধীনতা? তার মা বাবা একবারও কি
তাকে জিজ্ঞেস করে না— কে তোকে এভাবে যখনতখন
ফোন করে? কী সম্পর্ক ছেলেটির সঙ্গে তোর?

আমি প্রতিদিন দেখি। দেখি আর ভাবি—প্রেমালাপ কি
এত দীর্ঘ প্রলম্বিত হয়?
আমাদের যৌবনে তো ঘরে ঘরে ছিল না টেলিফোন, হাতে হাতে
ছিল না মোবাইল।
আমাদের যা কিছু কথা প্রেমপত্রে অথবা সন্তর্পণে
চতুর্দিকে দেখে কফি হাউসে বা নির্জনের পথে হাঁটতে হাঁটতে।
তখন আমাদের প্রেমালাপ উচ্চারিত শব্দখরচেও ছিল
যথেষ্ট কৃপণ।

তবুও ঘুমোও

ভাবনার গোপন অন্তরীক্ষে
জ্যামিতিক বিন্যাসে উড়ে যাচ্ছে বোমারু বিমান।
                    অথবা
হাস্যোজ্জ্বল সূর্যকে গুম করে
কালো আলখাল্লা গায়ে
উড়ন্ত পাহাড়ের মতো ছুটে আসছে
                    রাক্ষুসে পতঙ্গবাহিনী।
এইবার সুনিশ্চিত ধ্বংস হবে ফসলের মাঠ।
আজ
অহোরাত্র মস্তিষ্কের গোপন অসুখ কুরে খাচ্ছে
মনন ও মেধা।
এখন রাত্রি। যুবক রাত্রি।
বধু হে ঘুমোও। ঘুম ভাঙার সম্ভাবনাও যদি না থাকে
                    তবুও ঘুমোও।

দুই তরুণ পুলিশ

একটা ছোট গলিপথ এসে পড়েছে প্রধান সড়কে।
এই ছোট শহবে কালীপুজোব ভিড় সামলাতে, স্কুটাব-বাইক-গাড়িকে,
ওয়ান-ওয়ে ত্রো, নিযন্ত্রিত কবতে মোড়ের মুখে সেই মধ্যদুপুব থেকে
ঠায় দাঁড়িয়ে বয়েছে মাত্র পাঁচশো টাকা সম্মান-দক্ষিণার এক তরুণ ও
এক তরুণী পুলিশ।
মেয়েটা, মানে তরুণী-পুলিশ কিছুক্ষণ পরপর হাই তুলছে। বাইক আবোহী
এক ডোন্টকেয়ার তরুণ ওদেব নিষেধকে নিষেধ বলে পাত্তা না দিয়ে
শাঁ করে বেরিয়ে গেল।
ওরা অসহায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিড় দেখছে। পুজো দেখার সান্ধ্যসুযোগ
ওদেব নেই।
ওদেব চোখে শুধু এক তারিখের মহামূল্যবান শ'পাঁচেক টাকা। আর
স্বপ্ন, যদি কোনোদিন সত্যি সত্যি পুলিশের চাকরিটা জুটে যায়!

দুই, পঞ্চাশ

মা তুমি একদিন

মা তুমি একদিন,   একদিন
হৈমন্তিক নদীর মতো অরণ্যের স্নেহ, আর সূর্যের
                                        হাজার আলোকবিন্দু,
মা তুমি একদিন,   একদিন
তোমার বুকের মধ্যে সবুজ বেলগাড়ি, শ্রীহট্ট
                                        হাসনরাজা এবং
বুঝিনা-বুঝিনা এমন জীবন শুধু,
মা তুমি একদিন,   একদিন
সন্ধেবেলা বলেছিলে—জানিস্ খোকন, এক রাজপুত্তুর ছিলো,
অবিকল তোর মতন, দীঘির মতন চোখ, কোঁকড়ানো
চুল আর, আরো যেন কত সব ..
মা আজ, আমি এখন, অন্ধ রাজপুত্তুর,
                                        কখন যে
দিনের আলোক শেষ, রাত্রি নামে
                                        আমাদের গলিপথে—
নির্জন ঘুমের মধ্যে ফেরারী জ্যোৎস্না, ঘরে ফেরা
মানুষের মুখে কী যেন নেই, মা এইসব
কল্পনার মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণা,
মা, তোমার হাসি কেমন ঠিকঠাক মনে নেই,
মা, আমি অন্ধ রাজপুত্তুর, সারাদিন
                                        শুয়ে বসে
গাড়ির শব্দগুলি এই আসে, হঠাৎ পালায়,
মা তুমি একদিন,   একদিন
যদি দেখো, পুষি বেড়ালটা
আমার বুকের কাছে সারাদিন টুকটাক্ খেলা করে,
মা আমি যদি ঐ বেড়ালটার মতো ... ...।
মা আমার ভীষণ কষ্ট,
আমি রাজপুত্তুরও নই, বেড়ালছানাও নই,
মা আমি যে কী আমি,
মা তুমি একদিন,   একদিন
যদি স্পষ্ট করে বলো—খোকন তুই রাজপুত্তুর,
খোকন তুই ...।

সমুদ্র, রোদ্দুর এবং রাত্রির প্রতি

এই সমুদ্র,
আয় ছুটে আয়   ভাসিয়েছে   নগরবন্দর
সকল স্থল।
এই সমুদ্র,
আয় ছুটে আয়   এখন   তুই-ই আমার
নিত্য নিত্য আপনজন।

স্বগত : বুকের মধ্যে অসহ্য তিরিশের আগুন জ্বলছে। ড্রাগনের বিষাক্ত নিঃশ্বাসের মতো আগুন। এমন কেউ নেই—দয়িতা মা বাবা বন্ধুজন। সকলেই যার যার আয়নায় মুখ দেখতে ব্যস্ত। সকলেই কী এক অদ্ভুত ব্যস্ততায় লে-ল্যাণ্ড গাড়ির মতো ছুটছে। ফিরে আসছে দেশলাই-এর মতো দুর্গে। দড়াম্ করে বন্ধ করে দিচ্ছে দুয়ার-জানলা।

এই রোদ্দুর,
ফিরে যা   যা ফিরে যা   আসিস্‌নে আব
এই এখানে।
এই রোদ্দুর,
সূর্যকে বল   'নাই-বা এলে'   এই তুই-ই আমার
নিত্য নিত্য আপনজন।

স্বগত : এই পৃথিবী—আমার শৈশবের স্বর্ণকমল পৃথিবীর উপর এক দুর্গম এবং অশেষ রাত্রি নামছে। গাঢ় অন্ধকারের ভিতর ঢাকা পড়ছে খেলার মাঠ, আপিস-আদালত, নারী-পুরুষ, মানুষের ইতিহাস, আমার যাবতীয় আত্মীয়-অনাত্মীয় পশুকুল শত্রু-মিত্র সকল। এই পৃথিবী—আমার স্বর্ণকমল পৃথিবীর উপর ...।

এই রাত্রি,
আয় ছুটে আয়   তীব্রবেগে   আয় ছুটে আয়
আয়।
এই রাত্রি,
এখন   তুই-ই আমাব   বুকের কাছের
নিত্য নিত্য আপনজন।

রঙ নাম্বার

প্রস্তাবনা

নিজস্ব সংলাপ প্রলাপ নিয়ে কবিতা অকবিতা। কারণ
ঘটনাগুলো ইদানিং এইভাবে ঘটে যাচ্ছে ঃ

মূল কবিতা

এই আমি, তোমাদেব প্রিয় পীযূষ, কতবার ভুলক্রমে পৌঁছে
গেছি, বাজারেব বদলে ইস্টিশানে। এই আমি, কোনোমতেই
কোনো বিশেষ ঠিকানায় যেতে যেতে, পথ ভুলে,
গুমোট ভিড়ের মধ্যে অর্বাচীন গ্রাম্য যুবক, চতুর্দিকে
ভিন্নতব মানুষ, দোকান, ভিড়, গাড়ির পাহাড়। এবং
ধীরে ধীবে নিঃসঙ্গ অস্থিব মন, নদীর আলাপ কিংবা
প্রথম নারীব চোখে, কিরকম উজ্জ্বল খেলা; এই সমস্ত
অতীত স্মৃতির মতো, দূরে, বহুদূরে উড়ে যায় শরতের
শেষ বৃষ্টি। এখন তো এইখানে দামাল যুবার কণ্ঠে রঙিন
রুমাল, সিনেমার ফ্রন্ট স্টলে ইয়ার্কি, হুইসেল, তাবৎ
খেলুড়ে নারীর চোখে সুচতুর অভ্যর্থনা, বিছানা, আসবাবপত্র
এবং অশ্লীল হেসে—এই আমি আপনার।

অতঃপর ভুলভ্রান্তি। ঠিকানাবদল কিংবা ঠিকানাবিহীন শুধু
টেলিফোন হাতে নিলে রঙ-নাম্বার। এই আমি উনত্রিশেই
পঙ্গু বৃদ্ধের মতো হেঁটে হেঁটে, চোখে ছানি, একদিন
অক্লেশে ঠিকানা হারাই।

আমি, তুমি, সে

আমি	আমি এক ঃ একচক্ষু প্রবঞ্চক শৃগালের স্পর্ধা তো
দারুণ; ছুটে এসে সন্ধেবেলা হোটেলের বারান্দায়
কিছুক্ষণ পায়চারি,—মুগ্ধ দৃষ্টির দিকে খেলাচ্ছলে
তিনলাফ—মুর্গির ছানাগুলো দারুণ পুষ্ট ও নধর।

তুমি	তুমি এক রহস্যের শাড়ি পরে ঃ দ্যাখো তো,
দেখাচ্ছে কেমন; নাকি ভুলভ্রান্তি, চোখেমুখে
দুঃস্বপ্ন, তরল জ্যোৎস্নার মতো অলৌকিক কিছু নাকি,
অবিকল ভুতুড়ে মানুষ।

সে	সে এক মজার দৃশ্যের মতো রসিক ছাগল ঃ
সার্কাসের দড়ি বেয়ে সহজেই এপার-এপার—
জলজ্যান্ত ক্লাউন, অনায়াস বলে দিতে পারে—
কিঞ্চিৎ পরমায়ু এইভাবে অতিক্রান্ত যদি—মন্দ কি,

খেলাচ্ছলে হাসিখুশি জীবন কাটুক।

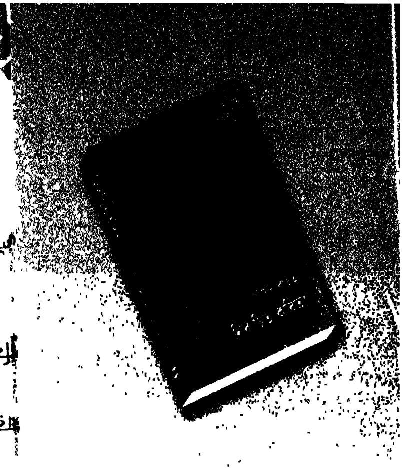
প্রেম বিষয়ক কবিতা

শুধু একটা খালি ট্রামের জন্য
          তোমাকে আরো দশ মিনিট এখানে আটকে রাখবো।
শীত নেই গ্রীষ্ম নেই কেমন একটা
          উজ্জ্বল আবহাওয়া দ্যাখো, সিনেমার বিজ্ঞাপনে
দুর্গার মুখ।
          দ্যাখো, কেমন একটা উজ্জ্বল পারিপার্শ্বিক।
একটা উপমা দিতে ভারি ইচ্ছে করছে,
          কলকাতা-আগরতলা-আকাশ থেকে কখনো
মেঘ দেখেছো? বহু নীচে পথ
          কিংবা নদী কিংবা
ঠিক ঐ রকমই বেলা-অবেলা ঠিক নেই এমন একটা
          উজ্জ্বল পারিপার্শ্বিক।
শুধু একটা খালি ট্রামের জন্য
          রাসবিহারীর মোড়ে
এক মিনিট দুই মিনিট তিন মিনিট শুধু তুমি
তুমি তুমি। তুমি কি এই ট্রামেই যাবে?
—না এটা ৩১ নম্বর।
ঐ পরেরটা?
—চেনা-জানা যদি কেউ। ঐ দূরেরটা?
—কি জানি যদি এক্সিডেন্ট করে!
বরং এসো, একটা সুস্থ ট্রামের জন্য
একটা খালি ট্রামের জন্য আরো কিছুক্ষণ
দাঁড়িয়ে থাকি।

এই সেই বাড়ি

এই সেই বাড়ি।
পলেস্তারা খসে খসে সাক্ষাৎ কংকাল। এই সংকীর্ণ গলিপথে
জন্মেছে যারা
তারা কৈশোর অতিক্রমণান্তে
এখন মধ্যযৌবনে, তাদের মধ্যে
একজনের চক্ষুও টানেনা এই বাড়িটা। তবে
দেশান্তরী এই মানুষই, হতে পারি আমি, হতে পার তুমিও,
বাড়িটা দেখে
মনে পড়ে কিছু কিছু প্রিয় মানুষের মুখ, কিছু কিছু উত্তাপ, কিছু কিছু
দুর্লভ হয়ে ওঠা স্মৃতির আকর্ষণ তাকে, আমাকে, হয়তো-বা
তোমাকে টেনে নিয়ে যায় কবি দরোজার সামনে। বলে—
বাড়িতে কেউ আছেন?
হতচকিত কোনো প্রত্যুত্তর সাড়া দেয়না। সে আবারো, হয়তো
আমি, হয়তো-বা তুমি—আরো জোরে, বলতে গেলে
চেঁচিয়ে ডাকলে—বাড়িতে কেউ আছেন?
কোনো শব্দ নেই।
ক্রোধ এসে জোরে ধাক্কা দিতেই, হুড়মুড় শব্দে ভেঙে পড়ল
দরজাটা।
হতভম্ব চক্ষু দেখল—মধুদুপুরেই ঘরের ভিতর মধ্যরজনীর
অধিকার।

দুঃখ, তোমার



বিষণ্ণ উদ্যানে বৈশাখ

জন্মজুয়াড়ী

প্রিয় কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত পংক্তিমালা

শ্রেষ্ঠ কবিতা

অবসরের আগে ও পরে

মন্ত্রপূত রুমাল

অরুণের আত্মসমীক্ষা ও অন্যান্য গল্প

নষ্ট আশ্বিনের মেঘ (পরিত্যক্ত)

স্যার, আপনার টেলিফোন

তোর্ষা সিরিজ

শ্রীচরণেষু বাবা

পীযূষ রাউতের কবিতা ঃ স্বপন নন্দীর ছবি

চিনি কম

পীযূষ রাউত ঃ উজ্জ্বল উদ্ধার

হ্যালো চীফ মিনিস্টার